শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

তত্ত্ব-পরিচয়

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
প্রণীত ও প্রকাশিত

কলিকাতা
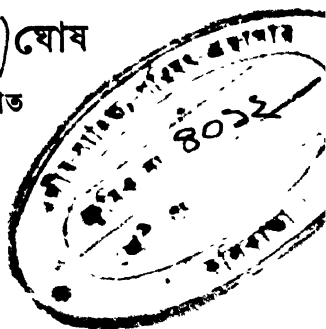
২১।৩ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৯, আশ্বিন

মূল্য ৷৷৹ আনা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

উৎসর্গ
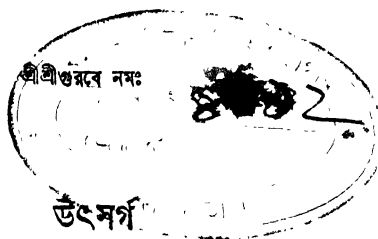
মহামহিম মহিমান্বিত দীন-প্রতিপালক

লালগোলাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ

রায় সাহেব বাহাদুর—

সকাশে,

বিহিতসম্মানপুরঃসরবিনীতনিবেদন।

মরুভূমিতে পান্থপাদপ আছে, নিয়মিত সূর্য্যোদয়-শূন্য দেশে উষার আলোক আছে, সমুদ্রের মধ্যেও আশ্রয় দ্বীপ আছে, স্বার্থপূর্ণ সংসারেও ভবৎসদৃশ করুণাময়, মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী রাজা আছেন। ইহা দেখিলে পরমেশ্বরের মহিমা স্মরণ হয়। এই প্রকারে অনন্তের স্মৃতি হইতে এ দীনের দ্বারা তত্ত্ব-পরিচয় গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু ইহা আপনার ন্যায় মহান্ পুরুষের পূজোপহার যোগ্য কি না, তাহা স্থির করিতে পারি নাই।

সর্ব্বত্র জলাশয় থাকা সত্ত্বেও একভাণ্ড জলের প্রয়োজন হয়, উজ্জ্বল শশধর-প্রদীপ্ত ধরণী মধ্যেও

ক্ষুদ্র দীপালোকের আবশ্যক হয়, বিশেষতঃ যিনি সর্ব্বাত্মা তিনিই এ পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় ; সেই জন্য সাহস করিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। এক্ষণে পুস্তকখানির প্রতি ভবদীয় কৃপাদৃষ্টিবোধে, ভক্তিভরে আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিদুরের তণ্ডুলকণা প্রদানের ন্যায় আপনারই শ্রীকরকমলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম। ইতি

১৮ই ভাদ্র চিরকৃতজ্ঞ
১৩১৯ সাল। শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

বিজ্ঞাপন

ঈশ্বর-বিশ্বাস বহু দূরের পদার্থ, এই জন্য দর্শন-শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ প্রণীত গ্রন্থে বিপুল যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত দর্শনশাস্ত্র পাঠে যে সকলেই অধিকার লাভ করিবেন, তাহা সম্ভব নহে। আর চিন্তাশীল ব্যক্তি শাস্ত্রপাঠে অধিকারী না হইলেই যে, অসীম সৃষ্টিকার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন তাহাও সম্ভব নহে। কেন না কি বিদ্বান্, কি অবিদ্বান্ সকলকেই যখন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, তখন তাহা হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা স্বাভাবিক ভিন্ন কৃত্রিম হইতে পারে না।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডই বেদ, আর বাহ্য ও অন্তর-জগতের কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করাই বেদ-পাঠ। এই পুস্তকে সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা বাহ্য এবং আন্তর জগতের ক্রিয়ার পর্য্যালোচনা মাত্র। পাঠকবৃন্দ নিজ নিজ দেহ ও অন্তঃকরণের ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া পাঠ করিলে উল্লিখিত বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিবেন।

আমার মত সন্দিগ্ধ চিত্তের লোক অনেক আছেন এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার তত্ত্ব জানিবার জন্য অনেকের মনেই অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যদি তাঁহাদিগের এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কিছুমাত্র সুবিধা হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম ও জীবন সফল মনে করিব। পরিশেষে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সমুদয় ব্যয়ভার লালগোলার রাজা বাহাদুর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই প্রকার কৃপা না করিলে হয়ত ইহা লোকচক্ষুর অগোচরেই নষ্ট হইয়া যাইত। নিবেদন ইতি

বিনীত নিবেদক
শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

সূচী

তত্ত্ব-পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

—✻—

জীব ও ঈশ্বর

প্রবাহিনীবক্ষঃস্থিত তরণীর যেমন ঊর্দ্ধ ও অধঃ স্রোতোরূপ দুইটী পথ প্রসিদ্ধ, জীব-জীবনের সেই প্রকার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ চির-বিখ্যাত। মানবের প্রবৃত্তি বহুমুখী। সে সুখ চায়, প্রণয় চায়, শান্তির অভিলাষ করে, ধন চায়, গৌরব চায়, যশঃ প্রার্থনা করে, রাজ্য চায়, সহায় চায়, কর্ত্তৃত্ব বাসনা করে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, কেহ যান-

বাহক, কেহ সেব্য, কেহ সেবক, কেহ দাতা, কেহ প্রার্থী, কেহ শাসক, কেহ শাসিত। ইহা ভিন্ন কেহ আজন্ম পুণ্য করিয়াও দুঃখী, কেহ পাপ করিয়াও সুখী, কেহ চেষ্টা করিয়াও প্রাপ্ত ধনরক্ষায় অসমর্থ, কেহ বিনা চেষ্টায় দৈবাৎ প্রাপ্ত-ধনে ধনী; কেহ মৃত্যুভয়ে সদা সতর্ক থাকিয়াও অকালে আয়ুহীন, কেহ আত্ম-হত্যা করিতে উপস্থিত হইয়াও তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে জানা যায় যে, প্রার্থিত বিষয় সকলের প্রাপ্য নহে এবং চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য কোন অদৃষ্ট বস্তুর কর্ত্তৃত্ব আছে। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা-হইলে বর্ত্তমান চেষ্টা দ্বারা সম্প্রতিই সুখ লাভ হইতে পারে না। বিশেষতঃ পার্থিব জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখময় বস্তু-আছে কি না তাহাও সন্দেহস্থল।

কেন না, আমরা রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের মধ্যে মন্দটীকে বাদ দিয়া উত্তম-টীকে উপভোগ করিতে পারিলেই সুখী হই; কিন্তু সুরূপ, কুরূপ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সুরস, বিরস আদি ভালমন্দ দুই বস্তু থাকিতে কেবল উত্তমটীকে চির-সঙ্গী করা মানবভাগ্যের অতীত। কেন না, আজি যাহা উত্তম, কালি তাহা অধম বোধ হইতে পারে, সুতরং যাহা হস্তগত হয় নাই, তাহার জন্যই মন লালায়িত থাকে, যাহা অধীনস্থ তাহাতে তৃপ্তিবোধ হয় না। যে স্থলে একটী অভাব পূরণ হইলেই আর আবশ্যক নাই মনে হইত, সে স্থলে শত শত অভাব মিটিলেও আশা পূর্ণ হয় না। যে দ্রব্যের উৎপত্তিতে সুখ আছে, তাহার বিনাশে যে দুঃখ হইবে তাহা নিশ্চয়, আর জগতে এমন কোন জিনিষ নাই, যাহা চিরস্থায়ী অপরি-

বর্ত্তনীয়। অতএব ক্ষণস্থায়ী দেহ ও ভোগ-লক্ষ্যবিশিষ্ট মানব সুখী হইবে কিরূপে? ভোগ্যবস্তুর পূর্ণতা থাকিলেও যখন আনন্দের সম্পূর্ণ অভাব থাকিতে পারে, তখন ভোগ ও আনন্দ এক বস্তু নহে। আর সবল ও পরিপুষ্ট দেহ থাকিলেও আনন্দের অভাব থাকে, নিদ্রাকালে প্রাণ থাকে, কিন্তু আনন্দ না থাকা হইতে পারে, স্বপ্নকালে মন থাকে, তথায়ও দুঃখশূন্য আনন্দ দেখা যায় না, জাগরণকালে বিচক্ষণ বুদ্ধি থাকে, তথাপি নির্ম্মল আনন্দের পূর্ণতা থাকিতে পারে না। সুতরাং দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে কেহই আনন্দস্বরূপ নহে। আনন্দ আনন্দই বটে, তাহা অন্য কোন পদার্থের রূপান্তর বা অবস্থান্তর হইতে পারে না। বরং বুদ্ধি, মন, প্রাণাদি বস্তুকে আনন্দের রূপান্তর বলিয়া বোধ

হয়, কেন না স্বার্থ-শূন্য পরমার্থ চিন্তাদ্বারা প্রেমসংযুক্ত পরমানন্দের উদয়কালে, বুদ্ধি ভাববিহ্বল হইয়া আত্মহারা হইয়া যায়। অত্যাচারীর হস্ত হইতে সতীর ধর্ম্ম-রক্ষা করিতে পারিলে, চোরের হস্ত হইতে সজ্জনের ধনরক্ষা করিতে পারিলে, অগ্নি বা জল হইতে মানুষ বাঁচাইতে পারিলে, পরক্ষণে যে আত্ম-প্রসাদ লাভ হয়, তাহা উক্ত পরমানন্দের আভাসমাত্র। এ অবস্থায় বুদ্ধির চেষ্টা, মনের চিন্তা, প্রাণের চপলতা, এবং দেহের কার্য্য থাকে না। সুতরাং ঐ চারিটী কোষও আনন্দময় হইয়া উঠে। আবার তথা হইতে পরিবর্ত্তনকালে দেখা যায়, একাকীস্থিত আনন্দই সর্ব্বাগ্রে ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া ইচ্ছাযুক্ত হয়। অতএব আনন্দের আনন্দান্তরের ইচ্ছা বা পূর্ব্বস্বভাব হইতে বুদ্ধি জন্মে,

বুদ্ধির পূর্ব্ব অবস্থা বিস্মৃতিরূপ ভ্রম হইতে মন জন্মে, মনের ভ্রমরূপ চঞ্চলতা দ্বারা প্রাণের গতি ও দেহের কার্য্য হয়। ভ্রম ও অন্ধকার একই রকমের বস্তু, আনন্দসংযুক্ত বুদ্ধির অভাবকে ভ্রম বলে, আর আলোকের অভাবকে অন্ধকার বলে। আলোকের নিকট হইতে দূরত্ব-অনুসারে আলোকমিশ্রিত অন্ধকারের নানারূপ অবস্থাভেদ হইতে হইতে অবশেষে যেমন আলোকহীন অন্ধকার হয়, সেই প্রকার বুদ্ধির আনন্দ বিস্মৃতি হইতে ভ্রমের জন্ম হইয়া দূরত্ব অনুসারে মন, প্রাণ, দেহাদিক্রমে বুদ্ধিসংযুক্ত ভ্রমের রূপান্তর হইতে হইতে অবশেষে দেহের ভোগবাসনা স্থলে কেবল বুদ্ধিশূন্য ভ্রম থাকে মাত্র। সুতরাং আনন্দের সম্যক্ বিকাশে যাহা ছিল, দেহের বিকাশে আর তাহা থাকিতে পারে না।

সেখানে আনন্দ প্রধান, দেহ অপ্রধান, এখানে দেহ প্রধান, আনন্দ অপ্রধান। সেখানে পঞ্চকোষের ক্রিয়া এক হইয়া আনন্দময়, এখানে পঞ্চ কোষের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন রহিয়া অন্নময়। সেখানে অভা-বের শূন্যতা, এখানে অভাবের পূর্ণতা। সুতরাং দেহের উপাদান-সংগ্রহের জন্য বুদ্ধিকে খাদ্যরূপে মৃত্তিকা, পানীয় রূপে জল, উত্তাপরূপে তেজ, শ্বাসপ্রশ্বাস রূপে বায়ু এবং দেহচ্ছিদ্র রূপে আকাশ ব্যবহার করিতে হইতেছে। মন আবার ইহাতেও পরিতৃপ্ত নহে, সুতরাং কর্ণের দ্বারা আকাশের গুণ শব্দ, ত্বকের দ্বারা বাতাসের গুণ স্পর্শ, চক্ষু দ্বারা তেজের গুণ রূপ, জিহ্বা দ্বারা জলের গুণ রস, এবং নাসিকা দ্বারা মৃত্তিকার গুণ গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা মনের ভোগ বলা যায়।

ইহা দেহের পক্ষে আবশ্যকীয় বস্তু নহে, যে হেতু সাধ করিয়া শব্দ না শুনিলে, স্পর্শসুখ উপভোগ না করিলে, এবং রূপ রস, গন্ধের সেবা না করিলেও দেহ রক্ষা হয়। আর মনের জন্যই যে এ সকল উপাদান প্রয়োজন তাহাও বোধ হয় না, কেন না, মন উক্ত রূপ বিষয়-চিন্তা বাদ দিয়াও সুস্থ এবং পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে। অতএব এই অপ্রয়োজনীয় ভোগবাসনাগুলি প্রয়োজনে আসে না, অথচ এই সকলকে ক্ষয় করে, আর নিজে কোন কালে পূর্ণ হয় না। সেই ভোগবাসনা ভ্রম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অতএব এই সুখ-দুঃখ-ময় ভোগাসক্ত জীব দুঃখশূন্য প্রকৃত আনন্দ পাইবার পাত্র নহে। সাংসারিক অতি সুখের অবস্থাতে যখন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা হয়, এবং অতিদুঃখের অব-

স্থাতেও সুখের আশা থাকে, তখন বিকৃত আনন্দ ভিন্ন প্রকৃত আনন্দ নিশ্চয় আছে, এবং তাহাই আমাদিগের আনন্দময় আত্মা। * ইহা নিবৃত্তি-মার্গের শেষ সীমায় বিদ্যমান। কিন্তু মৃগ যেমন স্বীয় নাভিগন্ধে বিমুগ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে করিতে পিপাসায় কাতর হইয়া অবশেষে মরীচিকার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমরাও সেইরূপ আনন্দের আশায় প্রবৃত্তিমার্গে ছুটাছুটী করিতে করিতে অবশেষে ভোগের শরণ লইয়াছি। এখানে মায়া-অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে, উদ্দেশ্যহীন ভোগের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, সেই জন্য সময়ে সময়ে দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিতে হয়, সংসারে অমঙ্গল আছে,

* জীবের দেহ যেরূপ অন্নময় কোষ, ঈশ্বরের দেহ সেইরূপ আনন্দময় কোষ।

মঙ্গল নাই, অশান্তি আছে, শান্তি নাই, ভয় আছে, অভয় নাই, বন্ধন আছে, মুক্তি নাই, অভাব আছে, পূর্ণতা নাই, দুঃখ আছে, আনন্দ নাই। কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে, যেমন প্রতিক্রিয়া দেখিলে ক্রিয়া স্বীকার করিতে হয়, বৃষ্টি পড়িলে মেঘ স্বীকার করিতে হয়, ধূম দেখিয়া অগ্নি স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ দেহের কার্য্য দেখিয়া জীবাত্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বর বিশ্বাস করিতে হইবে। তিনিই জীবের মঙ্গল, শান্তি, অভয়, মুক্তি, পূর্ণত্ব ও আনন্দ-স্বরূপ।

জল ও বায়ুসংযোগে বুদ্বুদ্ জন্মে এবং সেই জল ও বাতাসেই তাহা মিশিয়া যায়, সেই প্রকার জীবসকল ব্রহ্মাণ্ড উপাদান হইতে জন্মায় এবং দেহ, প্রাণ, মনাদি নাশের পর সেই ব্রহ্মাণ্ডেই

মিশাইয়া থাকে। সুতরাং জীবের উপাদান ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান হইতে ভিন্ন নহে। অতএব সমস্ত জীবশরীরে যে যে বস্তুর অংশ আছে, ব্রহ্মাণ্ডে তাহার পূর্ণত্ব থাকিবে। দেখা যায়, শরীরে অস্থি-মাংসাদি কঠিন পদার্থরূপে মৃত্তিকার অংশ আছে, বাহিরে সেই মাটীপরিপূর্ণ শরীরে শোণিত শুক্রাদি তরল পদার্থ-রূপে জলের অংশ আছে, বাহ্যজগতে ঐ জল বহুব্যাপক। শরীরে উত্তাপ-রূপে তেজ, শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে বায়ু ও দেহচ্ছিদ্ররূপে আকাশের অংশমাত্র দেখা যায়, বাহিরে তেজ, বায়ু, আকাশ অসীম বলিলেও চলে। ইহা ব্যতীত শরীরে অহঙ্কার, মন, ভাব, জ্ঞানাদি সূক্ষ্ম বস্তুর সত্ত্বা আছে, সুতরাং বাহ্যজগতে ঐ সকল বস্তুর এক একটী বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর স্তর থাকা সম্ভব।

কেন না, যাহা ব্রহ্মাণ্ডে নাই, তাহা কোথা হইতে দেহমধ্যে সংগ্রহ হইতে পারে? যদি বলা যায়, পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে যে দেহ জন্মিয়াছে, রাসায়নিক সংযোগ-বশতঃ তাহা হইতেই উক্ত অহঙ্কার মন ভাবাদি সূক্ষ্ম বস্তু জন্মিয়া থাকিবে; কিন্তু এই বাক্য স্বীকার করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, জগতে ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থের ন্যায় ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ আছে কি না?

মৃত্তিকা বস্তুটী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোচর, যে হেতু চক্ষে তাহার রূপ দেখিয়া, কর্ণে শব্দ শুনিয়া, জিহ্বায় আস্বাদ লইয়া এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শ ও নাসিকায় আঘ্রাণ করিয়া তাহা চিনিতে পারা যায়। আর বাতাসের গন্ধ, আস্বাদন ও রূপ নাই, সুতরাং নাসিকা, জিহ্বা ও চক্ষু তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

অতএব তিনটী ইন্দ্রিয়ের অতীত বহু-ব্যাপক বায়ুমণ্ডল যখন আকাশগর্ভে বিদ্যমান আছে, তখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত অহঙ্কারের তত্ত্ব বা অহংতত্ত্ব, মনের তত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব, ভাবের তত্ত্ব বা স্বভাব এবং জ্ঞানের তত্ত্ব বা প্রজ্ঞান না থাকিবার কারণ দেখা যায় না। তাড়িত যেমন বিশাল শক্তিসম্পন্ন পৃথিবীব্যাপক বস্তু, ইহা কদাচিৎ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, নতুবা সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয়াতীত ভাবে পৃথক্ অবস্থান করে, সেইপ্রকার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত সর্ব্বময় সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ চৈতন্য পদার্থের স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান আছে। কেন না, প্রতি জীবে যাহার অংশ দেখা যায়, তাহার পূর্ণত্ব না থাকা অসম্ভব, চৈতন্যের স্থূলত্ব সম্ভব নহে, সেই জন্য আমরা তাঁহাকে সর্ব্বময় বলিয়া জানিতে পারি

২

না, কিন্তু বহুব্যাপী তাড়িত যেমন বজ্ররূপে স্থূল হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে, পৃথিবীব্যাপী তেজ যেমন অগ্নিরূপে স্থূল হইয়া দর্শন-ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, সেই প্রকার সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্য স্বেচ্ছায় সর্ব্বরূপ ধারণে সমর্থ, জীব-চৈতন্য দেখিয়াই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়! কেন না জীবচৈতন্য তাড়িত হইতে বজ্রের ন্যায় ও তাপ হইতে অগ্নির ন্যায় সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য হইতে নামমাত্র স্বতন্ত্র হইয়া পরে ভিন্ন রকমের সংস্কার দ্বারা পরিপূর্ণের অংশ হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ভাবের ভিন্নতা ব্যতীত স্বরূপের ভিন্নতা হয় নাই, কিন্তু অংশ সর্ব্ববিষয়েই পূর্ণের তুলনায় অসম্পূর্ণ, সেই জন্য সর্ব্বজ্ঞের তুলনায় অল্পজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমানের তুলনায় অল্পশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পৃথক্ আমিত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, এই বস্তুকে

পঞ্চভূতজাত দেহ হইতে পরস্পরের মিশ্রণে উৎপন্ন বলা নিতান্তই অসঙ্গত। কেন না, ইহা মিশ্রপদার্থ নহে। মৃত্তিকা বস্তুটী অধিক ইন্দ্রিয়ের গোচর, এই জন্য তাহা মিশ্র পদার্থ, যে হেতু তাহাতে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের থাকিবার স্থান আছে, আর বাতাস অল্প ইন্দ্রিয়ের গোচর, সেই জন্য মাটীর তুলনায় তাহা অবিমিশ্র পদার্থ, কেন না, বায়ুমধ্যে মৃত্তিকা, জল, তেজ আদির স-শরীরে থাকিবার স্থান নাই। অতএব যে পদার্থসকল ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং মন ও বুদ্ধির অতীত, সেই চৈতন্য বস্তুকে মিশ্র পদার্থ বলা যাইতে পারে না। মৃত্তিকামধ্যে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ আছে, সুতরাং উক্ত ভুক্ত চতুষ্টয় মাটীর উপাদান, আর বাতাসেরমধ্যে মাটী, জল, তেজ আদির সশরীরে থাকিবার স্থান

নাই, কেবল আকাশ আছে, সুতরাং আকাশকেই বায়ুর মূল উপাদান বলা যাইতে পারে। যেমন চারিটি ভূতের সম্মিলনে স্থূল ও সীমাবদ্ধ মৃত্তিকা জন্মিয়াছে, সেই প্রকার মৃত্তিকার সহিত পঞ্চ ভূতের যোগে জীবের স্থূল ও সীমাবদ্ধ দেহ জন্মিয়াছে, অতএব পঞ্চভূতের অংশস্বরূপ দেহ হইতে চৈতন্য জন্মিলে তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম না হইয়া স্থূল ও সীমাবদ্ধ হইতেন, এবং তাঁহাকে বিশ্লেষণ করিলে পঞ্চভূতের অংশ পাওয়া যাইত। কিন্তু চৈতন্যের মধ্যে অস্থিমাংসাদিরূপ মৃত্তিকা নাই, শোণিত শুক্রাদিরূপ জল নাই, ইহা ভিন্ন উত্তাপ, বাতাস, আকাশ, অহঙ্কার, মন, ভাবাদি কোন বস্তুই তথায় পঁহুছিতে পারে না, এই জন্য চৈতন্য সর্ব্বাতীত, অথচ তিনি অস্থি, মাংস, শোণিতাদি সকল পদার্থে থাকিয়াও নির্লিপ্ত।

অতএব চৈতন্য পদার্থই যে এক মাত্র অবিমিশ্র, আর তাঁহা ভিন্ন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই যে মিশ্র পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমস্ত জীবদেহে যত মৃত্তিকা আছে, তাহা একত্র করিলে যেমন সমগ্র ক্ষিতির তুলনায় অত্যল্পমাত্র হয়, সমস্ত জীবদেহে যত জলীয় পদার্থ আছে, তাহা একত্রিত করিলে যেমন সমগ্র জলের তুলনায় সামান্য মাত্র হয়, সমস্ত জীব-দেহে যত তেজ, বায়ু ও আকাশ আছে, তাহা একত্র করিলে যেমন সমগ্র তেজ, বায়ু ও আকাশের অল্পমাত্র স্থান অধিকার করে ; সেই প্রকার সমস্ত জীব-হৃদয়ে যত অহঙ্কার আছে, তাহার সমষ্টিকে পূর্ণতম অহংতত্ত্বের সামান্য অংশ বলিতে হইবে। সমস্ত জীবহৃদয়ে যত মন আছে, তাহার সমষ্টিকে মহত্তত্ত্বের একদেশ মাত্র জানিতে হইবে, প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যত

ভাব আছে, তাহার সমষ্টিকে স্বভাবের কণামাত্র স্বীকার করিতে হইবে, প্রতি জীবমধ্যে যে চৈতন্য বা জ্ঞান আছে, তাহার সমষ্টিকে সর্ব্বব্যাপী মহা-চৈতন্য বা প্রজ্ঞানসিন্ধুর বিন্দুমাত্র অংশ ধারণ করিতে হইবে। অতএব মৃত্তিকা হইতে প্রজ্ঞান পর্য্যন্ত সকল বস্তুর অংশ লইয়া যখন অনন্ত অনন্ত জীব সৃষ্টি হইয়াছে, তখন সমগ্র মৃত্তিকা হইতে সমগ্র প্রজ্ঞান পর্য্যন্ত লইয়া যে বিরাট্ পুরুষের অবস্থান দেখা যায়, তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিবার বাধা দেখা যায় না। কিন্তু জীবের শরীর যেমন অচিরস্থায়ী, ব্রহ্মাণ্ডও সেই প্রকার বিনাশধর্ম্মশীল, সুতরাং তত্ত্ব সকল মায়া-ময় বা ইন্দ্রজাল মাত্র। সেই জন্য ঈশ্বরের বিকৃতরূপ পরিহার করিয়া স্বরূ-পের অনুসন্ধান আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

—*—

অনুভবের জন্মস্থান কোথায়

বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মানবের জ্ঞান ইন্দ্রিয় পঞ্চক ও অনুভবশক্তি বিদ্যমান আছে। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তু দেখে, আর অনুভব বাহ্য অন্তর উভয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। ইন্দ্রিয় সকল কার্য্যমাত্র দেখে, আর অনুভব কার্য্য-কারণ দুইটীই পরিদর্শন করে। অনেকে বলিয়া থাকেন, যাহা বর্ত্তমানে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহা অনুমানে স্বীকার করিব কেন? একথা মুখেই বলা হয় মাত্র, কেন না, প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে বা পরে অনুমানের সাহায্য না লইয়া কাহারও অন্তঃকরণ ক্ষান্ত

থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ অনু-
মান স্বীকার করিব না, একথা বলিবার
কাহারও অধিকার নাই। যেহেতু বর্ত্ত-
মানে প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়া তাহা যে,
এককালে সূক্ষ্ম বীজের অন্তর্গত ছিল,
এরূপ অনুমান করিতে হয়, বর্ত্তমানে
শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতির আধিক্য সত্ত্বে তদ্বি-
পরীত সম্ভব স্বীকার করিতে হয়, ব্যক্তি
বিশেষের সুখের হাস্য দেখিয়াও তাহার
পরিণাম দুঃখ ধারণা করিতে হয়। এ
সকল যেন নিত্য ঘটনা হইল, কিন্তু
কোন অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করিবার সময়
উপস্থিত হইলে, অনুমানের ব্যগ্রতাকে
সংযমিত রাখিতে পারেন? আর আদি-
কাল হইতে যদি কেহই অনুভবের অংশ
স্বরূপ অনুমানের সাহায্য না লইয়া বর্ত্ত-
মান মাত্র স্বীকার করিতেন, তাহা
হইলে কূপতড়াগাদিখননে জলসঞ্চয়,

মৃত্তিকার নিম্নস্তর হইতে ধাতু উত্তোলন, বৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক ফল, শস্যবপন দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য সম্পাদন হইতে পারিত না। এ সকল কথা অপেক্ষা স্পষ্ট আলোচনা এই যে, দিবারাত্রির মধ্যে চক্ষুর দৃষ্টি কত বস্তুর উপর পতিত হয়, কর্ণরন্ধ্রে কতরকম শব্দ প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বর্ণন করিতে হইলে, অনেক স্থানে স্বীকার করিতে হয়, "এ বিষয় আমি অনুভব করি নাই"। অতএব যখন দেখা যাইতেছে, অনুমানের পূর্ণত্বস্বরূপ অনুভব ব্যতীত কর্ণের শব্দ শ্রবণ-শক্তি, চক্ষুর রূপদর্শনশক্তি, নাসিকার গন্ধগ্রহণশক্তি, জিহ্বার রস-আস্বাদন-শক্তি এবং ত্বকের স্পর্শশক্তি কার্য্যকারিণী হয় না, তখন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য করিবার শক্তিই যে অনুভব, এরূপ ধারণা হইয়া থাকে। কেন না, বোবার কথা বলিবার

শক্তি নাই, অন্ধের দর্শনশক্তি নাই, তাহারা ইন্দ্রিয় এবং অনুভব সাহায্যে উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে, কিন্তু যাহার সকল ইন্দ্রিয় থাকাসত্ত্বেও অনুভব নাই, তাহাকে নিদ্রিত, মূর্চ্ছিত বা মৃত বলা যাইতে পারে। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইন্দ্রিয় সকল অনুভবশক্তির কার্য্য করিবার যন্ত্রমাত্র। এক্ষণে বুদ্ধিমান্‌গণের এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তিই যখন অনুভবে আছে, তখন অনুভব ইন্দ্রিয় সকলের সুযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা হইতে পারে না; যে হেতু তাহা হইলে যাহার দুই একটী ইন্দ্রিয় বিকল, তাহার অনুভবের অল্পতা হইত। জন্মান্ধ ব্যক্তির শ্রবণ ও স্পর্শশক্তির প্রাবল্য দেখা যায়, তাহাতে প্রমাণ হয় যে, অন্ধের দর্শন-ইন্দ্রিয়ে যে শক্তি কার্য্য-

করিতেছিল, তাহাই অন্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং যদি কাহারও পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না থাকে, তাহার ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থে অনুভবের অক্ষুণ্ণতা থাকিবে। কেন না স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য না থাকিলেও যখন অনুভবের ক্রিয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয় হইতে অনুভব ভিন্ন পদার্থ। সদ্যঃপ্রসূত শায়িত শিশুর অনুভব প্রত্যক্ষ করিলে, তাহা যে ইন্দ্রিয়সমাগত অনুভব, এরূপ বোধ হয় না; বরং তাহার স্বপ্ন ও জাগ্রত কালে পূর্ব্ব স্মৃতি বিদ্যমান দেখা যায়, অতএব আলস্যযুক্ত ইন্দ্রিয়গণকে অনুভব যে প্রকারে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, সেইরূপ অনুভবের সাহায্যেই শিশুর আদি ইন্দ্রিয় জাগ্রত হইয়াছে, ইন্দ্রিয় হইতে অনুভব জন্মে নাই। আর দেহই যদি অনুভবের জনক হইত, তাহা হইলে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-

কালে দেহ সমভাবে থাকাসত্ত্বেও অনু-
ভবের অবস্থা ভেদ হইত না। ইহা
ভিন্ন দেহ দেখিয়াই ব্যক্তিবিশেষের
অন্তরস্থ অনুভব বুঝিতে পারা যাইত,
আর মৃত্যুকালে দেহ থাকিতে অনুভবের
শরীর ত্যাগ অসম্ভব হইত। যদি বলা
যায়, শরীরস্থ শোণিতশুক্রাদি ধাতুই
অনুভবের জনক, তাহাও সম্ভব নহে।
কেন না, পানভোজনাদি দ্বারা ভৌতিক
উপাদান গ্রহণ না করিলে, ভূতজদেহ কৃশ
ও দুর্ব্বল হয়, এবং শোণিতাদি ধাতুক্ষয়
প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অম্ল আদি রোগে দীর্ঘ-
কাল অল্পাহারী ব্যক্তির অনুভব সমভাবে
থাকে। আর ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি ও অনা-
হারী যোগীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত অনুভব দেখিলে
তাহা দেহের কোন বস্তু হইতে জন্মে
নাই বলা যায়। অনেকে বলিয়া থাকেন,
দেহ হইতে ত্রিধাতু ও প্রাণ জন্মিয়াছে

এবং তাহাদিগেরই অনুভবশক্তি আছে, কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে, যে হেতু ধাতু ও প্রাণের যদি অনুভবশক্তি থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যগণের মধ্যে অনেকের একই ক্রিয়াবিশিষ্ট ধাতু ও প্রাণ থাকিতে অনুভবের বৈপরীত্য সম্ভব হইত না। আর নিদ্রাকালে ধাতু ও প্রাণের কার্য্য থাকা সত্ত্বে অনুভবের বিশ্রাম লাভ ঘটিত না। সুতরাং ইহারা কেহই অনুভবের জনক নহে। ইন্দ্রিয় সকল যে প্রকার রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ করে, অনুভব তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু অনুভব যাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রহণ করে, ইন্দ্রিয় অবশ থাকিলেও তাহাতে চেষ্টিত হয়; সুতরাং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা স্বাধীন বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। আর পঞ্চভূত হইতেও অনুভবের জন্ম নহে। কেন না পঞ্চভূত যে প্রকারেই সম্মিলিত

হউক, যাহাতে মৃত্তিকার অংশ আছে, তাহার গন্ধ থাকিবে, যাহাতে জলের অংশ আছে, তাহার রস ও আস্বাদন থাকিবে, যাহাতে তেজের অংশ আছে, তাহার রূপ থাকিবে, যাহাতে বায়ুর অংশ আছে, তাহা চর্ম্মে স্পৃষ্ট হইবে এবং যাহাতে আকাশের অংশ আছে, তাহার শব্দ না থাকা হইবে না। আর এই গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ গুণ অনুসারে পঞ্চেন্দ্রিয় তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবে। কিন্তু অনুভবে যখন পঞ্চ ভূতের কোন গুণ নাই, এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনটীই যখন তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তখন অনুভব পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। যে যাহাকে জানে, সে তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু। অনুভব দেহস্থ ও বহির্জগৎস্থ যাবতীয় বস্তুকে জানে, এই জন্যই সে চেতন;

আর দেহের অন্য অন্য উপাদানের মধ্যে কেহই অনুভবকে জানে না, সুতরাং তাহারা অচেতন। কেন না স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় অনুভব সূক্ষ্ম দেহে বা কারণদেহে গমন করিলে, পঞ্চভূতজ স্থূল দেহ যে জড় পদার্থ তাহা সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়। আর দেখা যায়, অনুভব দেহ হইতে বহুদূরের বস্তু অনুসন্ধান করিতে পারে, সুতরাং তাহা দেহের তুলনায় সুদূরব্যাপী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন গবেষণাপূর্ণ কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য অনুভবকে আনিতে হইলে, দেহ কর্ম্মহীন ইন্দ্রিয়চেষ্টাবিরত চিন্তাশূন্য হইয়া একাগ্র হইতে হয়, এরূপ অবস্থার অন্তর্মুখ জ্ঞান হইতে অনুভবশক্তি বিকাশ হইয়া বহির্ম্মুখ বৃত্তি দ্বারা কার্য্য সাধন করে। সুতরাং জ্ঞানকেই অনুভবের জনক বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে।

প্রকৃত কথা এই যে, স্বপ্নকালে সর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া নিজেই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ এবং জাগরণকালে নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপী, আর মৃত্তিকা জল আকাশাদি মধ্যে ভোগ অনুসন্ধানী অনুভব, জ্ঞানের সমধর্ম্মী ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। তবে জ্ঞান সাধারণতঃ অন্তর্ম্মুখ, আর অনুভব সাধারণতঃ বহির্মুখ এই মাত্র বিশেষ। যেমন মৃত্তিকা সর্ব্ব উপাদানের সহিত প্রস্তুত থাকিলেও বীজ ভিন্ন বৃক্ষ জন্মে না, ইচ্ছাশক্তি দমিত থাকিলে যথাকালে শুক্রশোণিতসংযোগ হইতে না পাইয়া সন্তান জন্মে না, সেই রূপ অনুভবজ্ঞান হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া দেহ মনন না করিলে জীবশরীরসংগ্রহ হইতে পারিত না। কেন না, এই অনুভব সমাধি অবস্থায় অন্তর্মুখ হইলে দেহ, ইন্দ্রিয়, ধাতু, প্রাণাদির ক্রিয়া লোপ হয়,

অতএব অনুভবকেই স্থূল দেহের সূক্ষ্ম বীজ বলা যাইতে পারে।

জগতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকার পদার্থ আছে। প্রথমে কারণ হইতে সূক্ষ্ম জন্মে এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল উৎপন্ন হয়। ইহার প্রমাণ এই যে, জীবের শরীর স্থূল, জাগ্রদাবস্থায় তাহার ক্রিয়া থাকে, মন সূক্ষ্ম, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কার্য্য থাকে, আর স্বভাব কারণ, সুষুপ্তি-অবস্থায় তাহা দেহ ও মনের তুলনায় নিষ্ক্রিয় থাকে।

এই কর্ম্মশূন্য অবস্থা হইতে প্রথমে মন জাগিয়া সে যেমন স্থূল দেহকে জাগরিত করে, সেই প্রকার দেহ শূন্য অবস্থা হইতে অনুভবের সহিত মন জন্মিয়াই স্থূল দেহের সংস্থান করিয়াছে। আরও বুঝিতে পারা যায়, স্থূল বস্তুর সাহায্য ভিন্ন কারণ পদার্থ থাকিতে

পারে, কেন না জাগরণ বা স্বপ্ন না হইলে সুষুপ্তি অবস্থায় কিছুই আবশ্যক থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তি না হইলে কেবল জাগরণ ও স্বপ্ন লইয়া জীবন ধারণ চলে না। এই জন্য স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব না থাকিতে কারণ পদার্থ ছিল এবং তাহাই আদি বলিয়া স্থূল ও সূক্ষ্মের জনক। যেমন বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগের কাম, ক্রোধ, লোভ আদি মনোবৃত্তি সকল কারণ-রূপে আছে, সেই জন্য তাহাদিগের আকার নাই। কিন্তু সময়-বিশেষে উহারা স্থূলরূপে পরিণত হইলে ব্যভিচারী, যুদ্ধার্থী ও পরস্বহারী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করে, সেইরূপ সূক্ষ্ম অনুভবের ক্রমিক স্থূলত্ব হইতে দেহ জন্মিতে না পারিবে কেন? আমাদিগের দেহ এই জন্মের, আর অনুভব বহুজন্মের, সুতরাং ঐ প্রাচীন অনুভব দ্বারা, কিরূপে

পরম কারণ হইতে তত্ত্ব সকলের স্থূলত্ব জন্মিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান চলিতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

—*—

সৃষ্টি ও স্রষ্টা

জীবের এই স্থূল দেহ গর্ভাবস্থায় জলীয় অংশমাত্র ছিল, ইহা যেমন সুস্পষ্ট অনুমান হয়, এই পরিদৃশ্যমান মৃত্তিকা-রাশি যে এককালে জলমাত্রে বর্ত্তমান ছিল, তাহাও সেইরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কেন না, সমুদ্রের জলকে লবণ-ময় ও ফেনপূর্ণ দেখিয়া এবং লবণ ও ফেনের কঠিনত্ব দেখিয়া সূক্ষ্মজলের মধ্যেই যে স্থূল মৃত্তিকার বীজ ছিল, তাহাতে সন্দেহ হয় না, অতএব শোণিত হইতে যেমন অস্থির জন্ম হয়, জল হইতে সেইরূপ মৃত্তিকা জন্মিয়াছে। আবার তাপ হইতে বর্ষা হয়, স্বেদ নির্গত হয়,

এই জন্য জানা যায়, জলের উৎপাদক তাপধর্ম্মবিশিষ্ট তেজ। যে হেতু যে স্থলে জল নাই, তথায় তাপ আছে, কিন্তু যেখানে তাপ নাই তথায় জল থাকিতে পারে না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, তাপধর্ম্মী তেজ জলের আদিতে ছিল, সুতরাং তাহাই জলের জনক। আর দেখা যায়, তেজের একাংশ হইতে অগ্নি জন্মে, ঐ অগ্নির স্থিতিনাশ বায়ুর অধীন, সুতরাং বায়ুকেই তেজের জনক বলিতে পারা যায়। কেন না, অগ্নি না থাকিলেও বাতাস থাকিতে পারে, কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে অগ্নি থাকে না, এই জন্য জানিতে হইবে বায়ু অগ্নি বা তেজের পূর্ব্বজ এবং তাহাই তেজের জনক। আর বাতাসের উৎপাদক অনুসন্ধান করিলে একমাত্র আকাশকেই লক্ষ্য হয়, কেন না বাতাস না থাকিলেও শূন্যস্থান থাকিতে পারে,

কিন্তু শূন্য বা আকাশ না থাকিলে বায়ু থাকিতে পারে না, সুতরাং আকাশ বায়ুর আদি ও জনক তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে বস্তু কার্য্য, কারণ পদার্থ তাহাপেক্ষা ব্যাপক ও সূক্ষ্ম, যেমন মৃত্তিকা অপেক্ষা জল ব্যাপক, কেন না মাটীর সর্ব্বত্র জল পাওয়া যায় এবং মৃত্তিকা জলদ্বারা বেষ্টিত। আবার জল অপেক্ষা তেজ ব্যাপক, যেহেতু জলের সর্ব্বত্র তাপ আছে। আর তেজ অপেক্ষা বাতাস ব্যাপক, কেন না, যে প্রদেশে তাপের অল্পতা দেখা যায়, সে স্থানেও বায়ুর পূর্ণতা বিদ্যমান আছে। আর বাতাস অপেক্ষা আকাশ ব্যাপক, কেন না, আকাশ বায়ুকে নিজ অভ্যন্তরে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আর মৃত্তিকা অপেক্ষা উপরিতন ভূতগুলি যে প্রকার ব্যাপক সেই প্রকার সূক্ষ্মও বটে। এ

সম্বন্ধে প্রমাণ এই যে, মৃত্তিকা বস্তুটী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, যেহেতু মৃত্তিকার গন্ধ আছে, আস্বাদন ও রূপ আছে; স্পর্শ-যোগ্য ও শব্দগুণবিশিষ্টও বটে, সুতরাং ইহা পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্ত এবং সেই জন্য সীমাবদ্ধ ও স্থূল। জল মৃত্তিকার জনক, কিন্তু জলের গন্ধ নাই, সুতরাং নাসিকা তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করিয়া, চক্ষে রূপ দেখিয়া, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করিয়া ও কর্ণে শব্দ গ্রহণ করিয়া সলিল পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার তেজ জলের জনক, কিন্তু তেজের গন্ধ ও স্বাদ নাই, সুতরাং নাসিকা ও জিহ্বা তাহাকে জানিতে পারে না। অগ্নির রূপ দেখিয়া চক্ষু, স্পর্শ করিয়া ত্বক্ এবং শব্দ শুনিয়া কর্ণ তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, আর অগ্নির জনক বায়ুর গন্ধ স্বাদ

ও রূপ নাই, সুতরাং নাসিকা, জিহ্বা ও চক্ষু তাহার পরিচয় লাভে অসমর্থ, কেবল স্পর্শ করিয়া ত্বক্ ও শব্দ শুনিয়া কর্ণ তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আর ভূতচতুষ্টয়ের উৎপাদক আকাশের গন্ধ নাই, আস্বাদন ও রূপ নাই, তাহা স্পর্শ-যোগ্যও নহে, সুতরাং এক মাত্র কর্ণ ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয় শূন্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। বাস্তবিক, নভোমণ্ডলের কোন প্রকার রূপ নাই। আমরা যে আকাশ দেখিতেছি, মনে করি তাহা বায়ুরাশি মাত্র। সকল ভূতের অভ্যন্তরে আকাশ রহিবার স্থান আছে। মৃত্তিকার মধ্যে শূন্যের আধিক্য আছে কি না আঘাত করিয়া শব্দ হইলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আকাশ একমাত্র কর্ণ প্রত্যক্ষ বস্তু বলিয়া অন্য ইন্দ্রিয়ের নিকট অব্যক্ত, কাজেই চারিটি স্থূলতর ভূতের বিকাশ

সাধনে সমর্থ হইয়াছে এবং গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ও দেহাদি নির্ম্মাণের উপাদান প্রদানপূর্ব্বক সকলের অবকাশরূপে বিদ্য-মান আছে। অতএব এক কালে শব্দ-গুণবিশিষ্ট আকাশ ছিল, তাহার সামান্য অংশের চঞ্চলতা দ্বারা বায়ু উৎপন্ন হইল, বাতাসের ধারণ-প্রসারণ-আকুঞ্চনশক্তিতে কতকাংশ উত্তপ্ত হইয়া তেজরূপে পরিণত হইল, তেজের ধর্ম্মস্বরূপ তাপের দ্রব-কারিত্ব-শক্তিতে জল, আর জলের ঘাত-প্রতিঘাতে মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া সমস্ত ভূতের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধকে ধারণ করিয়া প্রমাণ করিতেছে এক আকাশ ভিন্ন অপর চারিটী মিশ্র ভূত, এবং মৃত্তিকা মধ্যেও আকাশ, বায়ু, তেজ, ও জল বিদ্যমান আছে। এক্ষণে জানিতে পারা যাইতেছে, সূক্ষ্ম আকাশ হইতে যখন স্থূল মৃত্তিকা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে,

তখন নিরাকার বস্তুই যে সমগ্র সাকারের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যাহা ব্যক্ত তাহা হইতে অব্যক্তের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কর্ণেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ আকাশ অব্যক্ত নহে। সেই জন্য ইহা জীবের জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না, যেহেতু আকাশজ্ঞান উৎপাদক হইলে দেহ-ছিদ্ররূপ আকাশ বিদ্যমানে দেহের অজ্ঞতা উপস্থিত হইতে পারিত না। শূন্যধর্ম্মী তাড়িতাদি পদার্থও জীবের জ্ঞান-উৎপাদক নহে, যেহেতু তাড়িত সংযোগে জীবের মৃতদেহ সঞ্চালিত হইতে পারে বটে,কিন্তু সচেতন হইতে পারে না। তাড়িত আকাশস্থ বস্তু, আর আকাশ অর্থাৎ ফাক, তাহা স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাইবার পথের ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে আসিবার পথের মধ্য-স্থান। যেমন স্থূল-দেহীর জন্মস্থান গর্ভ,

তাহা স্বাধীনভাবে জীব উৎপাদন করে না, সেইরূপ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের জন্মস্থান আকাশ, তাহা ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা উৎপাদন করিতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দেহের যাহা কঠিন অংশ তাহা মৃত্তিকা, যাহা তরল তাহা জল, যাহা তাপ তাহা তেজ, যাহা সঞ্চরণশীল তাহা বায়ু, আর যাহা দেহ-চ্ছিদ্র তাহা আকাশ। ইহা ভিন্ন আকাশ, শব্দ ও শ্রবণেন্দ্রিয় এক বস্তু, বায়ু স্পর্শ-গুণ ও ত্বক্ এক বস্তু; তেজ, রূপ ও চক্ষু এক বস্তু; জল, রস ও রসনা এক বস্তু, মৃত্তিকা, গন্ধ ও নাসিকা একই পদার্থ। কেননা প্রত্যেক ভূত তাহার গুণ ও তৎকৃত ইন্দ্রিয়মধ্যে একটী না থাকিলে অপর দুইটীও না থাকার মত হয়। যেমন শব্দ না থাকিলে কর্ণ ও আকাশ অকর্ম্মণ্য হইবে, কর্ণ না থাকিলেও শব্দ

ও আকাশ অকর্ম্মণ্যবৎ হইবে। সেই প্রকার রূপ না থাকিলে চক্ষু ও তেজ অকর্ম্মণ্য হইবে, চক্ষু না থাকিলেও তেজ ও রূপ অকর্ম্মণ্য হইবে, আর অন্ধকার সময়ে তেজের বাহ্যবিকাশ না থাকিলেও চক্ষু ও রূপ না থাকা প্রায় হইবে, এই প্রকার বাতাস, স্পর্শ ও ত্বক্, জল, রস ও রসনা, মৃত্তিকা গন্ধ, ও নাসিকা মধ্যে একটীর অভাব হইলেই তিনটীর অভাব বোধ হয়, সুতরাং পঞ্চভূত যে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া এক ভাগে ইন্দ্রিয়রূপধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ইন্দ্রিয় সকল পঞ্চভূতের অতীত আর কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, সুতরাং আকাশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া পঞ্চ-ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া নিঃশেষ হইল। কাজেই ইন্দ্রিয়শক্তির প্রেরকস্বরূপ অনুভবের সাহায্যে আকাশের অতীত

বস্তুগুলির পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে।

জীবমাত্রেরই আমিত্ব অভিমান বা অহঙ্কার আছে, ইহা যে নাই এ কথা বলিতে পারা যায় না, কেন না, নিদ্রাকালে এই অহঙ্কার দেহ অবলম্বন করিয়া না থাকায়, দেহের প্রতি মমত্ব প্রকাশ করিতে আর কেহ থাকে না। আর ঐ সময় নিদ্রিত ব্যক্তির আমিত্ব গর্ব্বকে জাগাইতে হইলে, দেখা যায় যেন কোন গুপ্ত প্রদেশ হইতে তাহা দেহে ফিরিয়া আসিতে কষ্ট বোধ করিতেছে। অতএব দেহ ভিন্ন অহঙ্কারের পৃথক্ সত্ত্বায় অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আর সকল জীবের শরীরেই যখন অহংতত্ত্বের অংশ আছে, তখন বাহ্য প্রদেশে তাহার একটী পরিপূর্ণ স্তরও আছে। আমাদিগের শরীরস্থ আংশিক অহঙ্কার মন হইতে স্থূল

ও সংকীর্ণ এবং দেহচ্ছিদ্র আকাশ হইতে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। কেন না, তাহা মনের একদেশ হইতে জন্মে এবং দেহের সর্ব্ব উপাদানের উপর পরিব্যাপ্ত থাকে। ইহা ভিন্ন বাহ্য জগতে আমার জন, আমার রাজ্য, আমার দেশ প্রভৃতি বলিয়া সুদূর বিস্তৃত হয়। সুতরাং আমিত্ব অভিমান দেহস্থ শূন্য বা দেহ-চ্ছিদ্র অপেক্ষা বহুব্যাপক। আর অহ-ঙ্কারের সূক্ষ্মত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানা যায়, ইহা আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। কেন না, আকাশকে কর্ণ-ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু অহঙ্কারকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ করা যায় না। এক্ষণে বুঝিতে হইবে প্রতিদেহকে আবরণ করিয়া যেমন অহঙ্কার থাকে, প্রতি ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছাদন করিয়া সেই রূপ অহংতত্ত্ব আছে। দেহচ্ছিদ্র আকাশ

হইতে যেমন অহঙ্কার সূক্ষ্ম ও ব্যাপক, ব্রহ্মাণ্ড বা সমগ্র আকাশ হইতে সেইরূপ অহংতত্ত্ব সূক্ষ্ম ও বহু ব্যাপক! সুতরাং অহংতত্ত্বই যে আকাশের কারণ তাহা মনে করিতে পারি। কেন না পূর্ব্বে মৃত্তিকা, জল বাতাসাদির জন্ম-প্রকরণে দেখা গিয়াছে, যাহা স্থূল ও সীমাবদ্ধ তাহা কার্য্য, আর যাহা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক তাহা কারণ, বিশেষতঃ যে বস্তুর অভাবে অন্য বস্তুর বিলোপ হয়, সেই বস্তু বিলুপ্ত বস্তুর কারণ, এক্ষণে দেখা যাইতেছে পঞ্চভূতের প্রসিদ্ধ অংশ হইতে আমাদিগের পাঁচটী জ্ঞান-ইন্দ্রিয় বিকাশ হইয়াছে, এই ইন্দ্রিয় রূপ পঞ্চভূত স্বপ্ন ও বিকারের সময় ক্রিয়াহীন থাকিলেও আমিত্ব অভিমান থাকে, কিন্তু আমিত্ব বোধ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্য-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না; অতএব

আমিত্ব অভিমানের পূর্ণত্ব স্বরূপ অহংতত্ত্বই যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পূর্ণত্ব স্বরূপ পঞ্চভূতের আদি ও জনক তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই আমিত্ব অভিমান, মনের বিকার বশতঃ তাহার এক দেশ হইতে জন্ম-গ্রহণ করে, কেন না, অহঙ্কারশূন্য মন থাকিতে পারে, কিন্তু মন না থাকিলে 'অহং' 'মম', বোধ থাকে না। পূর্ব্বে জানা গিয়াছে, মন বস্তুটী মহত্তত্ত্বের অংশ *, আর অহঙ্কার অহংতত্ত্বের অংশ। এক্ষণে দেখিতে হইবে মহত্তত্ত্বের অংশ মন হইতে

* সাঙ্খ্যদর্শনে আছে অহংতত্ত্বের সত্ত্বগুণ হইতে মনের জন্ম হয়, আর বিষ্ণুপুরাণে মনেরই ত্রয়োদশ নামের মধ্যে মহৎ নাম দেখা যায়। অহংতত্ত্বের সত্ত্ব-গুণ আর মহতের তমোগুণ একই বস্তু, সুতরাং উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের মতের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য মহতের তমোগুণ হইতে মনের জন্ম স্বীকার করা হইল।

যখন অহংতত্ত্বের অংশ অহঙ্কার জন্মিতেছে, তখন সম্পূর্ণ অহংতত্ত্বকে যে পূর্ণতম মহত্তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, মহত্তত্ত্বের অংশ মন দেহস্থ থাকিয়াও দূরস্থ হইতে পারে, এমন কি কল্পনা দ্বারা পৃথিবী ছাড়িয়া অন্য অন্য লোকেও ভ্রমণ করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে দেহের তুলনায় সর্ব্বব্যাপী বলিবারও বাধা দেখা যায় না। কিন্তু জীবের মন অহঙ্কারের দ্বারা আবরিত হইয়া সংকীর্ণ হইয়াছে। যদি সকলের মন হইতে এই অহঙ্কারের আবরণ উন্মোচন করা যায়, তাহা হইলে যে একীভূত মহৎ মন থাকে, তাহাকেই মহত্তত্ত্ব বলে। এই মহৎ পদার্থের বিকার হইতে অহংতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে। চিন্তাদ্বারা চঞ্চলধর্ম্মী মন আবার অপেক্ষাকৃত স্থিরতর ভাব হইতে

জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; কেন না, চিন্তিত মন না থাকিলেও সুস্থির ভাব থাকে, কিন্তু ভাব না থাকিলে মন থাকিতে পারে না। সুতরাং মনের পূর্ণত্বস্বরূপ মহত্তত্ত্ব ভাবের পূর্ণত্ব স্বরূপ স্বভাবের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্বভাব বা প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্বাদি প্রকাশ করিয়া অসীম বিশ্ব প্রসব করিয়াছেন ; কেন না, স্বভাবের ভাবে যাহা গঠিত হয়, মনের কল্পনায় তাহা পরিস্ফুট হয় এবং অহংতত্ত্ব প্রভাবে আমিত্বসংযুক্ত হইয়া পঞ্চতত্ত্বরূপ দ্রব্যশক্তি দ্বারা ব্যক্ত হয়। স্বভাব পৃথিবীর তুলনায় সর্ব্বব্যাপী। কি ঈশ্বরসৃষ্ট, কি মনুষ্যগঠিত, সকল বস্তুতেই ভাব আছে, এ বস্তুটী এ ভাবে গঠিত, এ বস্তুটী এ ভাবে স্থিত ইত্যাদি কথা সকল স্থলেই বলা যায়। সুতরাং স্বভাবের ব্যাপার যে কতদূর প্রসারিত

তাহা চিন্তা দ্বারাও অন্ত করা যায় না। এই আদ্যন্তবিহীন, তিনকালে অবস্থিত স্বভাবকেই সৃষ্টি প্রকৃতি বা মায়া বলা যায়।

এই স্বভাব কিন্তু প্রজ্ঞানের অংশ দ্বারা প্রকাশিত, কেন না প্রজ্ঞানের অংশ-স্বরূপ জ্ঞান, সংজ্ঞা বা চৈতন্য না থাকিলে কোনরূপ ভাব থাকিতে পারে না, কিন্তু কোন প্রকার ভাব না থাকিলেও সংজ্ঞা থাকিতে পারে। সুতরাং স্বভাবের প্রকাশ-কারী প্রজ্ঞান স্বভাবের তুলনায় অসীম। সকলেই জানেন এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত জ্ঞানের কার্য্য। বাস্তবিক জ্ঞানের বিকাশ না থাকিলে যেমন দেহ থাকে না, সেইরূপ প্রজ্ঞানের বিকাশ না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড থাকে না। প্রজ্ঞান তিনকালেই সকলকে জানেন, এই জন্য ইহাঁকে সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্য বলা যাইতে পারে। আমরা

যেমন বায়ুসমুদ্রে ডুবিয়া আছি এবং সেই বায়ুকে শ্বাস প্রশ্বাসরূপে ব্যবহার করিতেছি; অথচ তাহার প্রতি লক্ষ্য করি না, সেইরূপ চতুর্দ্দশভুবনবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ড ও জীবকুল প্রজ্ঞানসমুদ্রে ডুবিয়া আছে এবং তাঁহাকে জ্ঞানরূপে ব্যবহার করিতেছে, অথচ সেই জ্ঞান যে সকলের জীবনের জীবন, সহায়ের সহায়, গতির গতি, আশ্রয়েরও পরম আশ্রয়, তাহা কাহারও লক্ষ্যস্থানীয় নহে। যেমন একখানি দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকট দেখিলে পশু পক্ষ্যাদি ইতর জন্তুগণ তাহাকে সজীব মনে করে, সেইরূপ এই পরিদৃশ্য-মান ব্রহ্মাণ্ডের গতিবিধি দেখিয়া তাহাকে সচেতন মনে হয়, কিন্তু চালক অভাবে বাষ্পীয় শকটের ন্যায় প্রজ্ঞান অভাবে সমস্ত বিশ্ব অচেতন মাত্র। এই জগৎ-চৈতন্যপ্রদ জ্ঞান সর্ব্বদেহে আছেন

বলিয়াই অনেকে অগ্নি, জল, বাতাসাদির উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে নিজ প্রয়োজনে নিয়োজন করিতে পারে। বাস্তবিক কথা এই যে, মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। রেল, তার প্রভৃতির কথা কি, যদি কেহ বলে এক ব্যক্তি মৃত জনের প্রাণদান করিতে পারেন, কি সজীব জন্তু প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহাও অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কেন না, সম্যক্ প্রকারে কায়, বাক্য, মন ও স্বভাব সংযম করিয়া যিনি প্রজ্ঞান আত্মাকে আমি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়াও প্রকৃতির উপরিতন পুরুষের ন্যায় সৃজন, পালন, ও ধ্বংস করিতে সক্ষম। জ্ঞান সর্ব্বব্যাপিত্বনিবন্ধন সকল জীবহৃদয়ে সমান ভাবে অবস্থান করিলেও যাহারা শরীর প্রভৃতি বাহ্য বিষয়েই লক্ষ্যকারী, তাহা-

দিগের জীবনধারণোপযোগী বুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞান থাকে না। দেহলক্ষ্যহীন, ইন্দ্রিয়-চেষ্টাবিরত, বাসনাবর্জ্জিত, চিন্তাশূন্য, একাগ্রচিত্ত, দুঃখের লেশমাত্রবিহীন ব্যক্তির শরীরে জ্ঞানের পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়। আমরা এপর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিয়া আসিতেছি, জীবদেহে তাহার নিদর্শন আছে বলিয়া, তাহাতে অবিশ্বাসের কারণ দেখা যায় না, আর যাহা সকল জীবের হৃদয়ে এক সঙ্গে কার্য্য করিতেছে, তাহা যে সর্ব্বব্যাপী বস্তু সে সম্বন্ধেও সন্দেহ জন্মিতে পারে না।

শরীরস্থ সংজ্ঞা ভিন্ন যেমন আর কাহারও ইচ্ছা করিবার শক্তি নাই, সেই রূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রজ্ঞান ভিন্ন আর কাহারও ইচ্ছাশক্তি থাকিতে পারে না। কেবল তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল

তত্ত্ব ইচ্ছাময় হইয়াছে মাত্র। বিষয় ইচ্ছা করিয়া বহির্ম্মুখ হইলে জ্ঞানের যেমন কৃত্রিম স্বভাব জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া বহির্ম্মুখ হওয়াতেই প্রজ্ঞানের স্বভাব বা প্রকৃতি জন্মিয়াছিলেন। ইচ্ছাশূন্য অবস্থা হইতে যেমন ইচ্ছা-বিশিষ্ট অবস্থা পৃথক্, সেইরূপ প্রজ্ঞান হইতে সৃষ্টি ইচ্ছাযুক্ত বিজ্ঞান স্বতন্ত্র পদার্থ। এই বিজ্ঞানের যে স্বভাব তাহাকেই প্রকৃতি নামক সৃষ্টির আদি উপাদান বলা হয়।

প্রথম ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হইলে যেমন জ্ঞানের অধিকাংশ আসক্ত জ্ঞানের সহিত যোগদান না করিয়া অনাসক্ত থাকেন, সেইরূপ সৃষ্টিকার্য্যে আসক্ত বিজ্ঞানের সহিত যোগদান না করিয়া প্রজ্ঞান আত্মা অনাসক্ত আছেন।

দেহ সৃষ্টি হইলেও যেমন শরীর,

অহঙ্কার, মন, ভাব আদির উপর জ্ঞানের সর্ব্বশক্তি অক্ষুণ্ণ আছে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইলেও পঞ্চতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি প্রভৃতির উপর প্রজ্ঞানের সকল শক্তি অবিচলিত থাকিবে। অতএব প্রজ্ঞান পুরুষই যে সকলের মূলাধার তাহাতে সন্দেহ নাই। জগতে যাহা কিছু প্রকাশ তাহা প্রজ্ঞানের সামান্য অংশমাত্র, সুতরাং যে প্রজ্ঞান হইতে কত কত ব্রহ্মাণ্ড উপাদান সহিত গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী আদি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যে প্রজ্ঞান হইতে কত কত সরিৎ, সাগর, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রকাশ হইয়াছে। যে প্রজ্ঞান হইতে কত কত জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, ধনী, মানী, রূপ ও গুণবিশিষ্ট আনন্দময় ব্যক্তি সকল নির্গত হইয়া থাকেন, সেই প্রজ্ঞানের যে কত শক্তি, কত জ্ঞান, কত

আনন্দ, কত দয়া, কত রূপ, কত গুণ, কত ঐশ্বর্য্য, কত মাহাত্ম্য, তাহা অচিন্তনীয় বলিতে হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, আমাদের হৃদয়শায়ী জ্ঞান তিন প্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতে পারেন। সুতরাং সেই তিন প্রকার জ্ঞানের পূর্ণত্ব-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী প্রজ্ঞান আছেন ইহাই তত্ত্বদর্শীদিগের অভিমত। জীবের অন্তর মধ্যে একপ্রকার জ্ঞানের সত্তা দেখা যায়, তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা পঞ্চভূতের অংশ সংগ্রহপূর্ব্বক জন্মান্তরের দেহ সংস্থান করিয়া রাখিতে পারেন। এই জ্ঞান-ইন্দ্রিয় কার্য্য করিতে পারেন, না করিতেও পারেন। কিন্তু পূর্ব্বস্বভাব-বশে বাধ্য হইয়া ইন্দ্রিয় বিষয় অভিলাষ করিয়া থাকেন। যে জ্ঞানের উল্লেখ করা হইল, ইহার পূর্ণত্ব স্বরূপ প্রজ্ঞান এই প্রকার সৃষ্টিকার্য্য করিতে পারেন,

না করিতেও পারেন। অথচ পূর্ব্বে পূর্ব্বে এরূপ সৃষ্টি করা স্বভাব ছিল বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছা করেন। এই জীব ও ব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশক প্রজ্ঞানের অংশকে সৃষ্টিস্বভাব-অনুগত বিজ্ঞানময় কোষের স্তর বলা যায়, ইহাতে কেবলমাত্র সংস্কার সঞ্চিত থাকে; পরে আকাশ হইতে বায়ু প্রকাশের ন্যায়, জল হইতে মৃত্তিকা প্রকাশের ন্যায় এই বিজ্ঞান হইতে সৃষ্টি-স্বভাবের ক্রমিক স্থূলতা বিকাশ হইয়াছে। এই সৃষ্টিস্বভাবব্যাপী বিজ্ঞান ভিন্ন আর এক প্রকার জ্ঞানের নিদর্শন দেহমধ্যে বিদ্যমান দেখা যায়। তাহা ইন্দ্রিয়কার্য্য-সম্বন্ধে অনাসক্ত হইয়া ইচ্ছা, শক্তি ও স্বভাব সংযত রাখিয়া কামনা ও সংকল্প-শূন্য অবস্থায় আত্মার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া উদাসীন ও অন্যমনস্কের মত ব্যবহারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

এই জ্ঞানের পূর্ণত্বকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা প্রজ্ঞান বলে। ইহা বিজ্ঞানের উপরিতন স্তরের বস্তু অর্থাৎ প্রজ্ঞানের নিম্নস্তরে সৃষ্টিস্বভাব, উপরিতন স্তরে আনন্দময় আত্মা এই দুয়ের মধ্যস্থ প্রজ্ঞানের কতকাংশ আত্মনিষ্ঠ আর কতকাংশ স্বভাব-নিরত। যাহা সৃষ্টিস্বভাববিশিষ্ট প্রজ্ঞান তাঁহার নাম বিজ্ঞান বা জীব, আর যাহা আত্মানন্দে নিমগ্ন, তাঁহার নাম প্রজ্ঞানানন্দ বা আত্মা, ইহাই উভয়ের বিশেষত্ব। বিজ্ঞান স্তরের মধ্যে যেমন সৃষ্টি করিবার স্বভাব আছেন, প্রজ্ঞান আত্মার মধ্যে সেইরূপ পালন করিবার উপযুক্ত মহাভাব আছেন। সেই মহাভাবের বিকাশে পৃথিবী সৃষ্টি করিলেও সমুদ্রের মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য দ্বীপ, উপদ্বীপ, ও পর্ব্বত-নির্ম্মাণের উপযুক্ত মৃত্তিকাবীজ আছে, যেমন বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করিলেও অসংখ্য

বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করিবার উপাদান আকাশ মধ্যে আছে, সেইরূপ সৃষ্টিস্বভাব প্রকাশ হইলেও সর্ব্বব্যাপী মহাভাব, প্রজ্ঞান আত্মার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া আছেন। এই মহাভাবরূপ উপাদান লইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ প্রজ্ঞান পুরুষ আত্মানন্দে মগ্ন রহিলেও যখন সৃষ্টিস্বভাবের অস্বাভাবিক অসৎ ব্যবহারে বা স্বভাব অতীত সদ্‌ব্যবহারে মহাভাবে আঘাত পড়ে, তখন প্রজ্ঞান পুরুষের বাহ্যদৃষ্টি বিকাশের কারণ উপস্থিত হয়, এবং তাঁহার অন্তরস্থ নিরুদ্ধ শক্তি, নিরুদ্ধ ইচ্ছা, নিরুদ্ধভাব উপাদানের অল্প মাত্র প্রেরণে ত্রিতাপ শাসন কিম্বা করুণা-বর্ষণ দ্বারা জগতের অসীম পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছাময়, সর্ব্বাত্মা প্রজ্ঞান পুরুষ যে ব্রহ্মাণ্ডের জনক, পালক, রক্ষক, প্রেরক, ধারক, শাসক, নাশক,

ও পূর্ণ-পরিণতিবিধায়ক তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অবিদ্যা বা মায়াতীতা মহাভাবস্বরূপা বিদ্যারূপিণী পরা প্রকৃতি তিন কালেই আছেন, এজন্য ইহাকে সৎ বলে, আর প্রজ্ঞান তিনকালে সকলকে জানেন, এই জন্য চিৎ বলে এবং আত্মা তিন কালেই সকলের প্রিয় অপেক্ষাও পরম প্রেমের বিষয়, এজন্য আনন্দ বলে। ইহা সর্ব্বময় ও পরিপূর্ণ, এই জন্য এই তিনের একাকার অবস্থাকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে।

জীবদেহের ইন্দ্রিয়াসক্ত ও সংযত জ্ঞানের অবস্থা ভিন্ন আর এক প্রকার জ্ঞানের অবস্থা এই দেহে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা জাগরণ-কালের মত অহঙ্কারযুক্ত নহে, স্বপ্নকালের ন্যায় মনযুক্ত নহে এবং সুষুপ্তি কালের মত স্বভাবযুক্তও নহে। প্রগাঢ় মনন

যোগে ধ্যানসিদ্ধ হইলে তন্ময়তা ও সমাধি দ্বারা ইন্দ্রিয় শক্তি, ধাতু, প্রাণ, মন ও ভাবলয় হইয়া জ্ঞানের যে সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয়, সেই তুর্য্যাবস্থাই ইহার পরিচয়।

আমাদিগের জ্ঞান জাগ্রৎ-অবস্থায় মৃত্তিকার নিম্নস্তর হইতে আকাশের উপর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারেন, শরীর, প্রাণ, অহঙ্কার, মন ভাব আদির দোষগুণ বিচার করিয়া তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন, আর স্বপ্নকালে মন অবলম্বন করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলেও সর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন সুষুপ্তিকালে দেহের যন্ত্র, ধাতু, শ্বাস, প্রশ্বাস অব্যাহত রাখিয়া স্বয়ং বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন; আর তুরীয় অবস্থায় শরীরকে অচল করিয়া, ধাতু, প্রাণ ও

মনকে সুস্থির করিয়া, নিজের আত্মায় সংযত নিমগ্ন থাকিয়া,—অব্যক্ত ও ব্যক্ত অচিন্ত্য ও চিন্তনীয় অজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। ইহাই জ্ঞানের প্রকৃত অবস্থা। বাস্তবিক কথা এই যে, জ্ঞান ভাবাদি যুক্ত হইয়া ক্রমশঃ স্থূলভাব ধারণ না করিলে তাহা অব্যক্তরূপেই থাকিত। কিন্তু যে জ্ঞানের পূর্ব্বস্বভাব বা সংস্কার আছে, তাহা পরিবর্ত্তন দ্বারা বিকাশ, বিকার ও বিনাশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একবার যে জ্ঞান ক্রিয়াশীল হইয়াছে, তাহার ক্রিয়া না থাকিলেও তাহাতে সংস্কার সঞ্চিত থাকে, সুতরাং সংস্কারক্ষয় না হইলে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের বিকাশ অবস্থায় তুরীয় অবস্থা জন্মে। বিকার অবস্থায় ভাব, মন, অহঙ্কারাদি; আর বিনাশ অবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয়, ও প্রাণ জন্মে। সুতরাং দেহাসক্ত জ্ঞানকে বাহ্য

জ্ঞান বা অজ্ঞান বলা যায় ; কেন না, জড় বস্তু উৎপাদন করিবার প্রক্রিয়া স্বরূপ মোহ ও ভ্রমসংযুক্ত সুষুপ্তি অবস্থা এই বাহ্যজ্ঞানের অন্তর্গত। তাহা যখন দেহাসক্ত জীবকে সকল সময়েই আক্রমণ করিতে পারে, তখন জীব যে অপূর্ণ অচেতন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের সুষুপ্তি অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দেহ ও মন অবসন্ন হয়, আলস্য, তন্দ্রা ও মোহ দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। সুতরাং তথায় চৈতন্যের কিছুমাত্র বাহ্য লক্ষণ থাকে, কেবল ধাতু ও শ্বাস বায়ুরূপ জড় বস্তুর কর্ত্তৃত্ব থাকে। আর সমাধি অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, মন স্ফূর্ত্তি-যুক্ত হইয়া নানাভাবশূন্য এক ভাব বা মহাভাব প্রাপ্ত হয় ; তখন আনন্দের তরঙ্গ প্রেম, অশ্রু ও পুলকরূপ ধারণ করিয়া বাহ্য শরীরে পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে

থাকে ; তাহার পর বাহ্যজ্ঞানের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ধাতু ও শ্বাস বায়ু লয় হয়, বলিয়া জড় বস্তুর সম্মিলনও থাকে না। আনন্দ, জ্ঞান ও ভাবের সূক্ষ্ম অংশ মহাভাব তথায় কর্ত্তৃত্ব করেন মাত্র। সেখানে দুঃখের সৃষ্টি নাই, কাজেই দুঃখনাশজনিত যে বাহ্যানন্দ তাহাও নাই, সেখানে ভ্রমের লেশমাত্র নাই, সুতরাং মোহনাশে যে জ্ঞান সে বাহ্যজ্ঞান নাই। সেখানে নানা ভাব নাই, কাজেই স্বভাবের কর্ত্তৃত্বজনিত অভাব-মোচন-বাসনা নাই, এই জন্য সমাধিস্থ ব্যক্তিকে ভাবাতীত, জ্ঞানাতীত এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত বলা যায়। নতুবা নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে বাহ্যজ্ঞান নাই বলিয়া যে আত্মজ্ঞান নাই, তাহা নহে, বাহ্যানন্দ নাই বলিয়া যে আত্মানন্দ নাই, তাহা নহে, বাহ্যভাব নাই বলিয়া যে

যে অবিকৃত আত্মভাব নাই, তাহা বলা যায় না ; অতএব আত্মজ্ঞানবশতঃ সর্ব্বজ্ঞ, আত্মশক্তিবশতঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ও আত্মভাববশতঃ সর্ব্বভাব লইয়া শূন্য অবস্থায় যে অবস্থিতি সেই সমাধিস্থ জ্ঞানের পূর্ণত্বকে তুরীয় ব্রহ্ম বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা বলা যায়।

এই তুরীয় অবস্থা যে, তত্ত্বসমূহ ও জীবের একাকার অবস্থা তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, মৃত্তিকা জলবেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া তেজোভ্যন্তরে অবস্থিত; তেজ, জল ও মৃত্তিকারাশিকে গর্ভে করিয়া বায়ুসমুদ্রে নিমগ্ন; বায়ু, মৃত্তিকা, জল ও তেজনির্ম্মিত জড়পিণ্ডকে অভ্যন্তরে লইয়া আকাশমধ্যস্থিত ; আকাশ আবার তত্ত্বচতুষ্টয়কৃত গোলকটিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অহংতত্ত্বের অন্তরস্থ; অহং-

তত্ত্ব সকলের আবরণ স্বরূপ হইয়া মহত্তত্ত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত ; মহত্তত্ত্ব সকলকে অন্তরে স্থাপন করিয়া প্রকৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত ; প্রকৃতি আবার গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় ভূমি হইতে মহৎ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত পিণ্ডটিকে জঠরে লইয়া প্রজ্ঞান আবরণে আবরিত হইয়া বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের আকার ধারণ করিয়াছেন। এমন অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড-দেহ লইয়া ত্রসরেণুর ন্যায় যাহার অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করিতেছেন, সেই এক, নিত্য, সত্য, অজ, অবিনাশী, অব্যয়, অনন্ত, আদ্যন্তরহিত, নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, স্বয়ংপ্রকাশ, পরাৎপর, পরমেশ্বরকে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের আত্মার আত্মা বা পরমাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। দেখা যায়, মৃত্তিকা স্বীয় জন্মস্থান জলমধ্যে স্বশরীরে প্রবেশ করিতে

পারে না, জল কিন্তু মৃত্তিকার বাহ্যাভ্যন্তরে বিদ্যমান আছে, আবার জল তাপের মধ্যে স্বশরীরে প্রবেশ লাভ করে না, কিন্তু তাপ জল ও মৃত্তিকামধ্যে সর্ব্বব্যাপী রহিয়াছে। এইরূপ তাপ বায়ুর জন্মস্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু বায়ু, তাপ, জল ও মৃত্তিকার সর্ব্বস্থলে প্রবেশ করিতে সক্ষম। ইহা ভিন্ন বায়ু আকাশের নিরূপিত স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারে না, আকাশ কিন্তু বায়ু হইতে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত তত্ত্ব সকলে সর্ব্বব্যাপিরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই ত গেল ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল-শরীরের কথা। তাহার পর অহংতত্ত্বরূপ সূক্ষ্ম-শরীরের একটী স্তর আকাশের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহার আবরকরূপে আকাশ হইতে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সকল তত্ত্বের অজ্ঞানতা উৎপাদনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র পরি-

ব্যাপ্ত আছেন। এই অহংতত্ত্ব কিন্তু স্বশরীরে মহত্তত্ত্ব মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, আর মহত্তত্ত্ব অহংতত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত থাকিয়া সকল তত্ত্বের চাঞ্চল্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। মহত্তত্ত্ব আবার স্বশরীরে প্রকৃতিমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, প্রকৃতি কিন্তু মহৎকে অন্তরে করিয়া সকল তত্ত্বের ভাব, অবস্থা, ভাগ্য, বা সংস্কার স্বরূপ হইয়া সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। এই প্রকৃতি প্রজ্ঞানানন্দ বা ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা মধ্যে স্বশরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু প্রজ্ঞান আত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সর্ব্বব্যাপী থাকিয়া মহা-চৈতন্যরূপে সকল তত্ত্বের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা দ্বারা সীমাবদ্ধ। সেই জন্য প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের

আত্মা পরমাত্মা মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে প্রবেশাধিকার পাইতে পারে না। কিন্তু পরমাত্মা নির্ব্বিবাদে সকল তত্ত্বের বাহ্যাভ্যন্তরে সর্ব্বসত্ত্বারূপে বিদ্যমান আছেন। অতএব যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু থাকিবে, যাহা কিছু ছিল, সে সমুদয় পরমাত্মার অস্তিত্ববশতঃ স্বীকার করিতে হয়। গর্ভস্থিত শারীরিক আদি অবস্থা চিন্তাদ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, মৃত্তিকা না থাকিলেও জল থাকিতে পারে, কিন্তু জল না থাকিলে মৃত্তিকা থাকিতে পারে না। এই প্রকার পরবর্ত্তী বা নিম্ন-স্তরের তত্ত্বগুলি না থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী বা উপরিতন স্তরের তত্ত্ব থাকিতে পারেন। সুতরাং আদিকালে যে একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি বলা যায়, পরমেশ্বর একাকী না থাকিয়া বর্ত্তমানের ন্যায় চিরদিনই সৃষ্টির সহিত

আছেন, তাহা হইতে পারে না। কেন না, দেহ যেমন এককালে ছিল না, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে না, সেইরূপ সৃষ্টি এককালে ছিল না, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে না। কিন্তু পরমেশ্বর তিনকালেই সমানভাবে অবস্থান করিতেছেন। তবে কখনও সৃষ্টির সহিত থাকেন, কখনও বা সৃষ্টিরহিত অবস্থায় থাকেন, এই মাত্র বিশেষ।

ঊর্ণনাভ যেমন জাল বিস্তার করিয়া পুনরায় তাহা নিজহৃদয়ে সংযত করে, কৃষকগণ যেমন উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিয়া কয়েক দিনের জন্য ধরণীকে শস্যপূর্ণা করিয়া পুনরায় তাহার বীজমাত্র গোলাজাত করিয়া রাখে, সেইরূপ সৃষ্টির বিনাশ হইলে সৃষ্টবস্তুর বীজগুলি পরমেশ্বরের অব্যাকৃত প্রকৃতিমধ্যে সঞ্চিত থাকে মাত্র। পরমেশ্বর এই সৃষ্টি

স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য না করায় তাহা বাল্যকালের বিস্মৃত ও ক্বচিৎ স্মৃতভাবের ন্যায় অব্যক্তরূপেই রহিয়া যায়। পরে যখন কালশক্তিপ্রভাবে সৃষ্টিস্বভাব বা মায়া পূর্ণতা লাভ করে, তখন পূর্ব্ব ইন্দ্রিয় কর্ম্ম স্মরণে মন বিকারের ন্যায় প্রজ্ঞানমনা পরমেশ্বরের প্রকৃষ্ট জ্ঞানের যে অংশ পূর্ব্বকল্পে সৃষ্টিকার্য্যে যোগদান করিয়া ছিলেন, সেই অংশ দ্বৈতভাবযুক্ত হইয়া অদ্বৈত পুরুষ হইতে পৃথক্ হইয়া থাকেন। কেন না, বায়ুমধ্যে সর্ব্বপ্রকার পুষ্পগন্ধের ন্যায়, অনন্ত বিশ্বের ভাব পরমেশ্বরের অন্তরমধ্যে নিহিত ছিল, তিনি যখন যে ভাবের প্রতি প্রজ্ঞান যোগ করেন, তাহাই তাঁহার প্রকৃতিস্বরূপা হইয়া থাকে, আর যে ভাবের প্রতি উদাসীন ও অন্যমনস্ক থাকেন, তাহা নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার ও অব্যক্তরূপে অবস্থান করে।

পরমেশ্বর যাহা হইতে পারেন, যাহা হইবেন এবং যাহা হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন না রাখিয়া অন্তর্দ্ধান করেন না। সেই জন্য অব্যাকৃত প্রকৃতিতে মিলিত হইয়া সৃষ্টি প্রকৃতির অস্তিত্ব এবং পরম পুরুষে মিলিত হইয়াও সৃষ্টি বিজ্ঞানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, কেবল আদি-পুরুষের ইচ্ছার অভাবে তাহা নিরুদ্ধ ও নিষ্ক্রিয় ছিল মাত্র। এক্ষণে পূর্ব্ব কল্পের সৃষ্টিস্বভাব বা মায়াশক্তি কালশক্তি দ্বারা পুষ্টা হইলে কালক্রমে সুপক্ক সুফল দৃষ্টে ভোগী ব্যক্তির ভোগবাসনার ন্যায় পর-মেশ্বরের পূর্ব্বস্বভাব উপভোগে ইচ্ছা হইয়াছিল, এইরূপে কালশক্তি, মায়া-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সামঞ্জস্য হইলেই সৃষ্টিবিকাশের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

স্বভাব ও ভোগ একশ্রেণীর বস্তু, যেমন নিদ্রা একটী ভোগ এবং তাহা

জীবের স্বভাব। সেইরূপ সৃষ্টি একটি ভোগ এবং তাহা ঈশ্বরের স্বভাব। এই স্বভাব কাল-অনুসারে নিদ্রার ন্যায় আসক্ত পুরুষকে মোহিত করিতে পারে। সুতরাং পরমেশ্বর সৃষ্টিস্বভাব দ্বারা নিজ অংশ-বিশেষকে অবস্থান্তরিত দেখিয়া সেই অংশকে ভোগফল উপভোগ করাইয়া নির্ব্বাসনা করিবার জন্যই পুনশ্চ সৃষ্টি-বিষয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ ইচ্ছা তাহার সর্ব্বাংশের সম্যক্ ইচ্ছা নহে; কেন না, ইহা অনাসক্ত, অন্যমনস্ক ও উদাসীন ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তথাপি সেই ইচ্ছাকারী অংশ যে প্রথম পুরুষ হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইলেন, সেই জন্য তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বা অদ্বিতীয়ের দ্বিতীয় পুরুষ বলা যায়। যেমন সমাধিস্থ পুরুষ পূর্ব্বস্বভাব দ্বারা আকৃষ্ট হইলে, তাঁহার ইচ্ছার পরক্ষণে

অনিচ্ছা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আদি-পুরুষ নিজ অভ্যন্তরস্থ স্বভাববিশিষ্ট অংশকে বহির্ম্মুখ করিতে গিয়া যে সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহার পরক্ষণেই সে বিষয়ে অনিচ্ছা জন্মিয়াছিল। প্রথম ইচ্ছাবেগের অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্বভাববিশিষ্ট অংশ প্রকৃতি অবলম্বন করিলেন। তাহার পর অনিচ্ছা দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত ও সংযত অংশ তাঁহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে বাহ্যান্তর স্মৃতির মধ্যস্থ রহিলেন। সুতরাং আদি-কালে যে প্রথম পুরুষ বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা হইতে দ্বিতীয় পুরুষরূপী প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ও তৃতীয় পুরুষরূপী প্রতি জীবের আত্মা সমাগত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রজ্ঞানমনা পরমেশ্বর যে পরমাত্মাকে বিভাগ করিয়া ত্রিবিধরূপে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেন, তাহা অসম্ভব নহে। মনের বিভক্ত

হইবার শক্তি আছে, তাহা অন্যমনস্কের অবস্থায় প্রমাণ হয়, অল্প মনোযোগেও কার্য্য সম্পাদন করা যায়। ইহা ভিন্ন মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তি সকল এক সঙ্গে বহু কার্য্যে চিত্ত নিবেশ করিতে পারেন। সেই জন্য প্রজ্ঞানময় পরমেশ্বরের অংশ অসম্ভব নয়। আমরা যেমন প্রবৃত্তিপথে চলিলে নিবৃত্তিপথ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, পরমেশ্বর সর্ব্বময় বলিয়া তাঁহার তাহা হইতে পারে না, আমরা সৎ অসৎ, জ্ঞান অজ্ঞান, আনন্দ নিরানন্দ প্রভৃতি দুই বিষয়ে এক সঙ্গে মন রাখিতে পারি না! যেহেতু একদেশী জীব যখন যে ভাবে আসক্ত হয়, তাহার বিপরীত ভাবের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বদর্শী প্রজ্ঞানমনা পরমেশ্বর দ্বেষ, অনুরাগ ও আসক্তিবিহীন। সেই হেতু স্বীয় প্রজ্ঞান শক্তিকে আবশ্যকমত বহু অংশে বিভক্ত

করিতে পারেন এবং নিজে নিশ্চল, নির্ব্বিকার প্রশান্তভাবে গুণহীন ও পরিপূর্ণ থাকিতে পারেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া আদিপুরুষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষকে বিকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার পূর্ণতার বিন্দুবিসর্গও হানি হয় নাই ; কেন না, স্বভাববিশিষ্ট পুরুষের ভাবের ভিন্নতা ভিন্নস্বরূপের ভিন্নতা হয় না। সুতরাং বহুব্যাপক তেজের একাংশ অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হইলে তাহার যেমন তেজ হইতে ভিন্নতা বা অপূর্ণতা সংঘটিত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নিজ অভ্যন্তর হইতে পুরুষদ্বয়কে বিশেষ করিয়া ভিন্ন বা অপূর্ণ হইলেন না। আদি পুরুষ সৎ, অসৎ, জ্ঞান, অজ্ঞানাদির অতীত, অথচ অসাধারণ ভাবে এই সকলের মধ্যস্থ হইতেও পারেন। দ্বিতীয় পুরুষ কিন্তু অসতের অতীত সতের

মধ্যস্থ, অজ্ঞানের অতীত জ্ঞানের মধ্যস্থ, দুঃখের অতীত আনন্দের মধ্যস্থ। এই জন্য তিনি প্রথম পুরুষের অংশ হইলেন আর তৃতীয় পুরুষ সৎ অসদাদির মধ্যস্থ কাহারও অতীত নহেন। এই জন্য তিনি দ্বিতীয় পুরুষের অংশ মাত্র। প্রথম পুরুষ ত্রিগুণের অতীত এবং নিয়মাধীন না হইয়া সগুণ হইতে পারেন। দ্বিতীয় পুরুষ তমঃ রজোগুণের অতীত শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণবিশিষ্ট এবং অসাধারণভাবে সর্ব্ব-গুণাশ্রয় করিতে সক্ষম। আর তৃতীয় পুরুষ ত্রিগুণের মধ্যস্থ ভিন্ন সাধারণভাবে গুণাতীত হইতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। প্রথম পুরুষ স্বভাবের অতীত, কিন্তু অসাধারণভাবে স্বভাবের মধ্যস্থ হইতে পারেন; দ্বিতীয় পুরুষ সৃষ্টিপ্রকৃতির অতীত কিন্তু পরা প্রকৃতির মধ্যস্থ, সেই জন্য ইচ্ছাময়রূপে সৃষ্টি-স্বভাবের সহিত

সম্বন্ধ রাখিতে পারেন ; আর তৃতীয় পুরুষ সৃষ্টি-প্রকৃতির মধ্যস্থ হইয়া বিকৃত স্বভাবরূপে চালিত হইবেন, স্বভাব অতি-ক্রম তাঁহার পক্ষে অসাধারণ ব্যাপার। প্রথম পুরুষ আত্মভাববিশিষ্ট বলিয়া এক, দ্বিতীয় পুরুষ দ্বিভাব বা পরা প্রকৃতি-বিশিষ্ট সেই জন্য অর্দ্ধনারীশ্বর বা পুরুষ-প্রকৃতিরূপে দুই এবং তৃতীয় পুরুষ বিকৃত প্রকৃতিবিশিষ্ট নানা ভাবের বশীভূত, সেই জন্য বহুরূপে পরিণত হইতে পারেন। যেমন আলোক অন্ধকারের অতীত তাপ হইতে অগ্নি জন্মিলে আলোকের সহচর অন্ধকার তাহার কত-কাংশ আক্রমণ করে, সেইরূপ সকলের সব এবং সবার অতীত আদিপুরুষের অংশ সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ দ্বিতীয় পুরুষ বহির্ম্মুখ হইলে তাঁহার কতকাংশকে অসৎ অজ্ঞানদুঃখরূপ মায়া স্পর্শ করিয়া থাকে

এই মায়াযুক্ত আত্মদর্শনবিমুখ বিজ্ঞান বস্তুকে জীবসমূহের সমষ্টি বা তৃতীয় পুরুষ বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় পুরুষ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞানশীল হইলেও প্রথম পুরুষের অংশ বলিয়া তাঁহার তুলনায় অজ্ঞান, কেন না, যাহার পূর্ণত্ব অসীম, তাঁহার নিকট অংশ সসীম, যাহার পূর্ণত্ব আদ্যন্তরহিত, তাঁহার তুলনায় অংশ আদ্যন্তবিশিষ্ট। এইরূপে যাহা নিত্য, তাহার তুলনায় অংশ অনিত্য, যাহা সত্য তাহার তুলনায় অংশ অসত্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সূর্য্যালোকের তুলনায় দীপালোকের ন্যায় অংশ সকল বিষয়েই পূর্ণের তুলনায় অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এই অসম্পূর্ণতা বশতঃ যে অভাব জন্মে, তাহা পূরণ-করণার্থ তৃতীয় বস্তুর সত্তা জন্মিয়া থাকে। এই হেতু সতের অভাবে অসৎ, জ্ঞানের অভাবে

অজ্ঞান, আনন্দের অভাবে দুঃখের সৃষ্টি পূর্ণের অংশ হইতেই সম্ভব হইয়াছিল। এই অসৎ অজ্ঞান দুঃখকেই মায়া বলে। তাহা আলোক হইতে দূরে অন্ধকারের ন্যায় সৎ চিৎ ও আনন্দ হইতে দূরে প্রতি-পত্তি লাভ করিয়াছেন এবং সৎ-চিৎ-আন-ন্দের যে অংশ মায়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া অন্ধ-কারহত আলোকের ন্যায় মায়ামুগ্ধ হইয়া-ছিলেন, তাঁহাকে দ্বিতীয় পুরুষ হইতে ভিন্ন তৃতীয় পুরুষ হইতে হইয়াছিল।

এই পুরুষ সৃষ্টির প্রতি স্থিরলক্ষ্য-বিশিষ্ট হওয়াতে একদেশদর্শী হইয়া সর্ব্ব-দর্শিতা হারাইয়া ছিলেন, এক সৃষ্টিবিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়াতে সর্ব্বজ্ঞতা-বিহীন হইয়া-ছিলেন, একমাত্র সৃষ্টিশক্তিকে অবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিবিরহিতপ্রায় হইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষ হইতে ভিন্ন হইয়াছিলেন। এইরূপে পূর্ণব্রহ্ম

আদিপুরুষ হইতে ঈশ্বর ও জীবরূপ স্বতন্ত্র অংশ হইলে সত্ত্ব ও রজোসংযুক্ত জীবপ্রকাশক বিজ্ঞানময় তৃতীয় পুরুষের স্বভাব ঈষৎ চঞ্চল হওয়াতে তাহার সামান্য অংশ দ্বারা রজঃপ্রধান মহত্তত্ত্ব জন্মে। এই রজঃপ্রধান মহৎ মন-স্বভাবের তুলনায় চঞ্চল, কাজেই তাহার একাংশ অতি চঞ্চল হইয়া অহং সংযুক্ত হওয়াতে রজঃ ও তমঃ প্রধান অহংতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। এই অহংতত্ত্বের কতকাংশ তমোগুণপ্রাধান্য দ্বারা নিজ স্বরূপে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞান ও ভ্রম বশতঃ সুষুপ্তির ন্যায় শূন্যধর্ম্মী হইলে আকাশ-রূপে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল, পুনঃ পুনঃ অংশ হওয়ার জন্য সে স্থলে সৎভাব অসৎপ্রধান, জ্ঞানভাব অজ্ঞানপ্রধান ও আনন্দভাব দুঃখপ্রধান হওয়াতে অহং-তত্ত্বের তমোগুণজনিত মোহ অবস্থায়

আকাশের জন্ম হয়। এককালে যাহা সত্ত্বপ্রধান জ্ঞানশক্তি ছিল কালক্রমে তাহা রজঃপ্রধান কর্ম্মশক্তি অবলম্বন করিয়া তমঃপ্রধান দ্রব্যশক্তিরূপে পরিণত হইল, এবং এই আকাশের উপরিভাগে পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্ব সকলের ক্রিয়া থাকায় শূন্যের চাঞ্চল্য দ্বারা বায়ু, তেজ, জল মৃত্তিকাদি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞান যেমন জীবের অস্তিত্বের হেতু, অজ্ঞানতা সেইরূপ জড় বস্তুর অস্তিত্বের কারণ।

যেমন সত্যের বিকার মিথ্যা, সত্য ছিল তাহার প্রমাণ, সুখের বিকার দুঃখ, সুখ ছিল তাহার পরিচয়, সেইরূপ জড়-প্রধান স্থানে প্রজ্ঞানের বিকার অজ্ঞান, নিজের অস্তিত্ব দ্বারা প্রজ্ঞানকে সপ্রমাণ করিতেছে মাত্র। আর এই মৃত্তিকা হইতে প্রজ্ঞান আত্মা পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহের বিন্দু বিন্দু অংশ লইয়া সকলের সমষ্টিতে

গ্রহ উপগ্রহ জীব উপজীব স্থাবর জঙ্গম আদি নানা জাতীয় বস্তুর উৎপত্তি হেতু সৃষ্টিকার্য্যের পূর্ণতা সাধন হইয়াছে।

আদি সৃষ্টিকালে পরমেশ্বর ভাবিয়াছিলেন, আমি একাকী আছি, বহু হইব। প্রথম পুরুষের এ ইচ্ছা তাঁহার আদিবিকাশ দ্বিতীয় পুরুষ হইতে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইয়াছিল। তখন মৃত্যুলোকোৎপন্ন জনগণ পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা আপনা হইতে ভিন্ন ও অপূর্ণ হইলাম কেন? তদুত্তরে পূর্ণ পুরুষ বলিলেন, তোমরা আমা হইতে ভিন্ন বা অংশ হইয়াছ ইহা মনে করিও না, যাহা ছিলে তাহাই রহিয়াছ। সত্য লোকবাসিগণ দেখিলেন, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু কালক্রমে সে ধারণা রহিল না আমি অমুকের পুত্র অমুক ধারণায় সিদ্ধান্ত হইল।

এই সৃষ্টিস্রোত কারণ হইতে সূক্ষ্মতম হইয়া স্থূলতম রূপ ধারণ করিতে অনেক সময় আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত তত্ত্ব উৎপত্তির পর যে জীব সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নহে; কেন না তত্ত্ব ও জীব প্রকৃতি ও পুরুষ শ্রেণীর বস্তু; পুরুষ ভোগী হইলেই প্রকৃতি ভোগ্য বস্তু হইয়া থাকেন, পুরুষ দেহী হইলেই প্রকৃতি দেহ সংস্থান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। সুতরাং যখন জড় প্রকৃতি ছিল না, তখন চেতন প্রকৃতির মধ্যেও পুরুষের বিশেষত্ব ছিল। সেই জন্য আদিকালেও বর্ত্তমানের ন্যায় যে উপাদানের ভোগস্থান সেই উপাদানের ভোগী জীবের দেহ ছিল। সুতরাং যখন অন্নময় কোষের উপাদান পঞ্চতত্ত্ব, প্রাণময় কোষের উপাদান অহংতত্ত্ব ও আকাশ, মনোময় কোষের উপাদান বিকৃত প্রকৃতি

ও মহত্তত্ত্ব, বিজ্ঞানময় কোষের উপাদান অব্যাকৃত প্রকৃতিপ্রধান। বিকৃত প্রকৃতি ছিল না; তখনও কেবল অব্যাকৃত প্রকৃতি উপাদানের আনন্দময় কোষবিশিষ্ট অসংখ্য দেহী পরমাত্মা হইতে পৃথক্ অবস্থান করিতেন। ইঁহারা পরমপুরুষের আদি বিকাশ প্রজ্ঞানমনা দ্বিতীয় পুরুষের মানস সন্তান মাত্র। স্বীয় পিতার ভাব অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, ও নির্ব্বিকার তাঁহারা সত্যলোকবাসী, যাঁহারা সৎকর্ম্মে আসক্ত, তাঁহারা জনলোকবাসী, আর যাঁহারা অসৎকর্ম্মকে তপস্যা দ্বারা ক্ষান্ত রাখেন, তাঁহারা তপোলোকবাসী হইয়া কেবলমাত্র আনন্দময় কোষকে দেহ স্বীকারপূর্ব্বক অব্যাকৃত প্রকৃতি-নির্ম্মিত সত্য, জন ও তপঃ নামক এই তিন ব্রহ্মলোককে পূর্ণ রাখিয়া সৃষ্টির সূত্রকারী

রূপে অবস্থান করিতেন। পরে আনন্দ ভোগের সহিত বিজ্ঞান উপভোগের সময় উপস্থিত হইলে, এই ব্রহ্মলোকের দেহী সকলের কতকাংশের চেষ্টায় পরা ও অপরা প্রকৃতি উপাদানে মহর্লোক নির্ম্মাণ হয়, এবং তাহাতে আলোকবাসী বহু-সংখ্যক আনন্দময় কোষধারী জন আসিয়া বিজ্ঞানময় কোষ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। তার পর কেবল সৃষ্টি-স্বভাব উপভোগে অতৃপ্ত, বহুসংখ্যক মহর্লোকবাসীর চেষ্টায় ঈশ্বর-ইচ্ছা উৎ-পাদন হইলে পরা ও অপরা প্রভৃতি যোগে মহত্তত্ত্ব সংগ্রহ হয় এবং সেই উপাদানে স্বর্গলোক নির্ম্মিত হইল। তাহাতে মহর্লোকবাসী বহুসংখ্যক দেহী আসিয়া আনন্দময় ও বিজ্ঞানময় কোষকে অপ্রধান করিয়া মনোময় কোষ প্রধান দেবতারূপে অবস্থান করিতে থাকেন। ইহারা সকলে

সংকল্পজনিত বিষয় উপভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়া তপস্যারূপ চেষ্টা করিলে ঈশ্বর ইচ্ছা ক্রমে অব্যাকৃত প্রকৃতি, বিকৃত প্রকৃতি, মহৎ ও অহংতত্ত্ব উপাদানে ভুবোলোক গঠিত হয়। আর স্বর্গবাসী দেবতা সকলের বহুসংখ্যক দেবতা আনন্দময়, বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোষকে অপ্রধান ধারণা করিয়া প্রাণময় কোষকে প্রধান দেহ স্বীকারপূর্ব্বক ভুবোলোকে বাস করেন। এই অন্তরীক্ষবাসী জীবের মধ্যে অনেকের প্রাণময় দেহে এবং তদুপ-যুক্ত বিষয় ভোগে তৃপ্তি হয় নাই। সেই জন্য তাঁহাদিগের অস্বাভাবিক গতি দেখিয়া ঈশ্বর-ইচ্ছা দ্বারা পরা ও অপরা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু তেজ ও জল উপাদানে ভূলোকের সৃষ্টি হইল। আর তাহাতে প্রাণময় কোষ প্রধান প্রেতাত্মার ন্যায় পিতৃলোক বা ভুবর্লোক

বাসী জনগণ দলে দলে আসিয়া আনন্দময় বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষকে অপ্রধান করিয়া অন্নময় কোষ প্রধান স্থূল দেহ ধারণ করিলেন। কিন্তু জীব এত করিয়াও নিজরূপ হারাইতে পারিলেন না। যিনি আদি সৃষ্টিকালে একোঽহং বলিয়াছিলেন, এখনও তিনি শিবোঽহং বলিতে পারেন। অতএব তিনিই অংশ-রূপে প্রকৃতি, আর তদপেক্ষা পূর্ণরূপে পুরুষ, তিনিই অংশদ্বারা দেহ, আর তদপেক্ষা পূর্ণরূপে দেহী, তিনিই অংশ দ্বারা ভোগ ও তদপেক্ষা পূর্ণরূপে ভোগী সাজিয়াছেন এবং তিনি অংশদ্বারা সৃষ্টি করিয়া তদপেক্ষা পূর্ণরূপে স্রষ্টা সাজিয়া নিজে সকলের অতীত অবস্থায় ও পরি-পূর্ণ রূপে বিদ্যমান আছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

—*—

প্রলয়ের আভাস ও পুনর্জ্জন্ম

সময় পূর্ণ হইলে যেমন জীবদেহ নষ্ট হইয়া থাকে, কালপূর্ণ হইলে সেই প্রকার ঈশ্বরের দেহ বা ব্রহ্মাণ্ড বিলয় প্রাপ্ত হয়। দিবসের শেষভাগে যেমন সুষুপ্তি অবস্থা আসিয়া জাগ্রৎ অবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে, কল্পের শেষভাগে সেই প্রকার প্রলয় অবস্থা আসিয়া সৃষ্টিস্বভাবকে বিলয় করে। এক বারে বা ক্রমে ক্রমে অনিয়ম করিয়া দেহকে নষ্ট করিয়া দিতে যেমন ইচ্ছাশক্তির কর্ত্তৃত্ব আছে, ব্রহ্মাণ্ডকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে সেই প্রকার ইচ্ছা-শক্তিরূপিণী প্রকৃতির কার্য্যশক্তি আছে। এই প্রকার প্রলয় ভিন্ন সুনিয়মে সুব্যবস্থায়

থাকিয়া কালপূর্ণ হইলে ঈশ্বর-ইচ্ছায় মৃত্যুর ন্যায়, ঠিক নিয়মে চলিয়া কল্পান্তে ঈশ্বর-ইচ্ছাক্রমে প্রলয় হইয়াও থাকে।

যেমন প্রাণ স্থির বায়ুতে গমন করিলে দেহ বিনষ্ট হয়, মনের চিন্তারূপ চাঞ্চল্য গত হইলে প্রাণ লয় হয়, বিজ্ঞানের প্রাধান্য সমুপস্থিত হইলে মনের লয় ঘটে, আনন্দের প্রাবল্য অবস্থায় বিজ্ঞানের বিলয় সাধন হইয়া থাকে, সেইরূপ জলের প্রবলতায় ক্ষিতির লয় হয়, তেজের প্রাধান্যে জল শোষিত হয়, বায়ুর শক্তিতে তেজ উপশান্ত হয়, আকাশের প্রাবল্যে বায়ুর চাঞ্চল্য রহিত হয়, অহংতত্ত্বের উৎকর্ষে শূন্য আকাশ অহংভাবে পূর্ণ হয়, মহতের প্রাবল্যে অহংতত্ত্ব বিলুপ্ত হয়, প্রকৃতির পূর্ণতায় বিকৃত প্রকৃতি বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইহাই কাল ও গণনাশূন্য প্রাকৃতিক প্রলয়ের স্বরূপ।

আনন্দের আকাঙ্ক্ষায় জীবের জন্ম এবং আনন্দের আশারহিত বিষাদে মৃত্যু হয়। অতএব অন্নময় কোষ সৃষ্টি ও বিনাশ করিতে যেমন আনন্দময় কোষের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে, সেইরূপ বিকৃত প্রকৃতির সৃষ্টি ও বিনাশ সাধন করিতে অব্যাকৃত প্রকৃতির বাধারহিত শক্তি আছে। এই কারণে সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই পুনরায় বিনষ্ট হইতে পারিবে। এবং প্রলয়কালে উপাদান অভাবে অন্নময় আদি কোষ বাদ দিয়া আত্মা কেবল আনন্দ-ময়কেই দেহ স্বীকার করেন। ভূলোকে যেমন অন্নময় অন্তর্গত কল্পিত আনন্দ আছে, সত্যলোকে সেইরূপ আনন্দের অন্তর্গত কল্পিত অন্নময় দেহ থাকে। আর এখন যেমন আনন্দময় কোষ বিস্মৃত

ও ক্ষণিক স্মৃত, তখন সেইরূপ আত্মার সৃষ্টিপ্রকৃতি বিস্মৃত ও ক্ষণিক স্মৃত অবস্থায় থাকিবে। এই কারণেই প্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এক্ষণে জানিতে পারিলাম, স্বাভাবিক স্থিতি যাহার আনন্দময়, অস্বাভাবিক গতি তাহার অন্নময়। সুতরাং অন্নময় কোষ-ধারী জীবেরও যখন অস্বাভাবিক গতি আছে, তখন ভূলোকের নিম্নস্তরে সপ্ত পাতাল ও সপ্ত নরকের যে উল্লেখ আছে, তাহা মিথ্যা নহে। কেন না, অন্নময় কোষাদি বাদ দিয়া যেমন কেবল আনন্দ-ময় থাকিতে পারে, সেইরূপ আনন্দ হইতে অন্নময় পর্য্যন্ত কোষকে অপ্রধান করিয়া কেবল দুঃখ থাকিতে পারে; এবং তাহাকেই নরক বলিতে পারা যায়। তাই বলি, পাপকর্ম্মশীল জীবের মৃত্যুর পর নরকভোগও অসম্ভব নহে।

আমাদের বর্ত্তমান শরীর অস্থায়ী, কিন্তু জীবন অস্থায়ী নহে। কেন না, শরীর লইয়াই আমিত্ব নহে। গর্ভাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এ শরীর ছিল না বলিয়া যে আমি ছিলাম না, তাহা কে বলিবে? আবার মৃত্যুর পর এ শরীর থাকিবে না, তাই বলিয়া যে আমি থাকিব না, তাহা হইতে পারে না। কদলীবৃক্ষের যেমন একটি বল্কল পরিত্যাগ করিলে অপরগুলি থাকে, অন্নময় কোষ ত্যাগ করিলে সেই-রূপ প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ থাকে। এখন যেমন অন্ন-ময় প্রধান কোষপঞ্চক আছে, তখন সেই-রূপ প্রাণময় প্রধান পঞ্চকোষ থাকিবে। কেন না, অন্নময় কোষের উপাদান রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধবিশিষ্ট পঞ্চভূত বায়ুস্থ পুষ্পগন্ধের ন্যায় প্রাণের সহিত অবস্থান করে। বর্ত্তমানে যেমন আমাদের

প্রাণের প্রতি সদা লক্ষ্য নাই, তখন সেইরূপ জড় শরীরের সূক্ষ্ম উপাদান রূপ, রস আদির প্রতি সদা লক্ষ্য থাকে না মাত্র।

এই অবস্থাবিশিষ্ট জীবকে সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিত বলা যায়।

জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিরূপ যে তিনটি অবস্থা আমাদিগের আছে, তাহা সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের নিদর্শন স্বরূপ, জাগরণকালে ও সৃষ্টিকালে স্থূল দেহ থাকে, স্বপ্নকালে ও স্থিতিকালে সূক্ষ্ম দেহ থাকে, সুষুপ্তি-কালে ও বিনাশকালে কারণ-দেহ রহিয়া যায়।

পরিবর্ত্তন সকল কালেই চলিতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে কাহারও লক্ষ্য নাই মাত্র। প্রভাতে জাগরণ হইল, নিমেষ, পল, দণ্ড আদিক্রমে সময় গত হইলে যেমন স্বপ্নও বিঘোর নিদ্রার কাল

আসিবে ; শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসরাদি ক্রমে কাল পূর্ণ হইলে, সেইরূপ প্রলয়ের অবস্থা ও মৃত্যু-দশা উপস্থিত হইবে। বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষের চিন্তা বৃদ্ধি হয়, তাহার কারণ দেহ বিনষ্ট হইলে যাহা থাকিবে তাহাই পরিপুষ্ট হইতেছে মাত্র।

দেহ অবশ ও ইন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হইলেও যেমন স্বপ্নাবস্থা থাকে, সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গ ক্রমে ক্রমে মরিতে থাকিলেও বিকারের অবস্থায় অসংযত চিন্তা থাকে। তাহার পর দেহনাশজনিত মোহ দ্বারা মন শূন্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও তথা হইতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। সুষুপ্তি অবস্থা হইতে অলক্ষ্যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিয়া যেমন প্রথমে স্বপ্নযোগে জীব সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া পরে স্থূল দেহকে জাগ্রৎ করে, সেইরূপ মৃত্যুর পরেও অলক্ষ্যে পরিবর্ত্তন

হইতে হইতে প্রথমে জীব মনোময় সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে স্থূলদেহ সংগ্রহ করে। সুষুপ্তির পূর্ব্বে ও পরে যেমন স্বপ্ন হইতে পারে, বিনা-শের পূর্ব্বে ও পরে সেইরূপ স্থিতি হইতে পারে। জাগরণের শেষ অবস্থায় দৃঢ়চিন্তা যেমন নিদ্রাভঙ্গের সর্ব্বাগ্রেই স্মরণ হয়, সেইরূপ বিনাশের পূর্ব্বের সুদৃঢ়ভাব সৃষ্টির প্রথমেই স্মরণ হইয়া থাকে। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে যেমন প্রাণের গতি আবরিত থাকে, জন্ম বিকার ও বিনাশ-কালেও সেইরূপ প্রাণময় কোষ থাকিতে পারে। প্রাণ দেহত্যাগ করিলে জীবের সাকারদেহ ক্রমে ক্রমে বহুব্যাপী পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু প্রাণ নিরাকার, তাহা সাকার দেহের ন্যায় পচিয়া খসিয়া যাইতে পারে না, এবং তাহার সঙ্গে জড়দেহের

সংস্কার এবং অজড় মনোবিজ্ঞান ও আনন্দের সংস্কার থাকে বলিয়া, তাহা সাধারণ বায়ুতে মিশিয়া যাইতেও পারে না। সুতরাং তাহা দেহের তুলনায় অবিনাশী। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাণ সাধারণ বায়ু নহে। তাহা ভুবর্লোক বা স্থির বায়ুরূপ ব্যোমলোকের সম্পত্তি, তাহা অন্নময় দেহে আবদ্ধ থাকায় গ্রহের নিকটস্থ বায়ুর ন্যায় চাঞ্চল্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জন্য শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য হইয়া থাকে। এই শ্বাস প্রশ্বাসরূপ বহির্ব্বায়ু যে বায়ুর আকর্ষণে দেহমধ্যে গমনাগমন করে, সেই স্থির বায়ুকেই প্রাণ বলে। ইহাকে সাধারণ বায়ু বলা যায় না। প্রাণ যদি সাধারণ বাতাস হইত, তাহা হইলে উভয় নাসিকাদ্বার অনাবৃত থাকা সত্ত্বেও এক নাসায় প্রবাহিত হইত না এবং সুস্থ শরীরে আড়াই দণ্ড অন্তর ইহার পরিবর্ত্তন

ঘটিত না ; ইহা ভিন্ন কখন কোন গুণের সময়, কখন কোন তত্ত্বের সময় ইত্যাদি অলৌকিক বিষয় প্রাণগতি দ্বারা নিরূপিত হইতে পারিত না। সুতরাং নানারূপ সংস্কারসংবদ্ধ প্রাণ জন্মের পূর্ব্বে ছিল, এবং মৃত্যুর পরে সাধারণ বায়ু হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদিও প্রাণময় কোষের অন্তর্গত মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষ দেহ-পাত-জনিত মোহে অভিভূত হইয়া মৃত্যুর পরেই শূন্যধর্ম্মী আকাশরূপী হয় বটে, কিন্তু সুষুপ্তির পর যেমন স্বপ্ন হইয়া থাকে, মৃত্যু মোহভঙ্গের পর প্রাণময় কোষ প্রধান জীবের সেইরূপ আমিত্ব স্মৃতি জাগ্রৎ হয়। তখন সেই আতি-বাহিক দেহ প্রেতাত্মারূপে পিতৃলোক বা অন্তরীক্ষ ভুবর্লোকে গমন করেন, সেই স্থানে আত্মকৃত বাসনা ও বিজ্ঞান-

কৃত সংকল্প লইয়া প্রাণের দেহ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বস্মৃতি হেতু রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে এবং এই জড়ত্ব বা গুরুত্ব হেতু পুনরায় পিতৃলোক হইতে ভূলোকে আগমন করিতে হয়। এই সময় আনন্দের বাসনায়, বিজ্ঞানের সুমন্ত্রণায়, মনের সংকল্পজনিত চেষ্টায়, প্রাণের অত্যধিক চপলতায়, নিরাকার কর্ম্মশীল জীব ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সমধর্ম্মী, সমগুণ, সমক্রিয়, দেহীর দেহে প্রাণবায়ুর সহিত প্রাণরূপে প্রবেশ করে এবং কিছু দিনের মধ্যে তাহার কতকাংশ তেজরূপে পরিণত হইলে, উক্ত জীবধারী পিতার মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাহাতে ঐ তেজ জল বা শুক্ররূপে পরিণত হয় এবং তাহা পিতৃদেহ হইতে চ্যুত হইয়া মাতৃশোণিতে সংযোজিত হইতে যায়। এই

সময় পূর্ব্বোক্ত কোষচতুষ্টয়-সংযুক্ত প্রাণবায়ু শুক্রের অগ্রবর্ত্তী হইয়া মাতৃ-জঠরে গমন করিয়া শুক্র-শোণিতের মধ্যস্থ হয় বলিয়া তাহা বুদ্বুদাকার ধারণ করে। সেই জল বুদ্বুদময় দেহ ক্রমে ক্রমে মাতৃভুক্ত অন্নরস দ্বারা ভূমির অংশ সংগ্রহ করিয়া দৃঢ় হইলে প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাদি প্রস্তুত হয় এবং পঞ্চতত্ত্বের যোগে অবয়ব পূর্ণ হইলে শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। ইহাকেই জন্মান্তর বা পুনর্জ্জন্ম বলে। জন্মের পর পশু প্রভৃতি জীব যে আপনা হইতেই স্তন্যপান করে, তাহা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। এক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম, এই দেহ, এই জীবন, এই আয়ুই আমাদের চিরদেহ, চিরজীবন, চিরআয়ুঃ নহে। সুতরাং যদি অনন্ত জন্মের স্মৃতি এককালে সমুদিত হয়, তাহা হইলে জগৎ জুড়িয়া পিতা,

মাতা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্রাদি আত্মীয় দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য পূর্ব্ব-স্মৃতি রোধ করিয়া নূতন জীবন পত্তন করা হইয়াছে। দুগ্ধপোষ্য শিশু বড় হইলে পূর্ব্বস্মৃতি হারাইয়া ফেলে ; তাই বলিয়া সেই শিশু যে বালক বা যুবক হইবে না, তাহা নহে। সেইরূপ আমা-দের অসীম কালের স্মৃতি নাই বলিয়া আমরা যে সত্যলোকোৎপন্ন জীব নহি, তাহা হইতে পারে না। সুতরাং জড়-দেহ লইয়া বা জড়-দেহের আধিক্য বাদ দিয়া জীবের স্থিতি না ঘটিবে কেন ? এবং মাটী, জল, তেজাদি লইয়া বা বাদ দিয়া অব্যাকৃত প্রকৃতি থাকিতে না পারিবার কারণ কি ? অতএব জানিতে পারিলাম, সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশাতীত বস্তু প্রকৃতি-ভাণ্ডারে নাই। রূপান্তর, অবস্থান্তর ভিন্ন স্থিরভাবও নাই, সুতরাং স্বভাব-

অন্তর্গত কোনও পদার্থ অস্তিত্বশূন্য হইতে পারে না। কখন সাকার বা স্থূল, কখন নিরাকার বা সূক্ষ্ম, কখন কারণ বা অচিন্ত্যরূপে অবস্থান করেন মাত্র। অতএব জগতের বস্তু-সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিলেও এক জাতীয় ব্যতীত বহু জাতীয় নহে।

পৃথিবী ও মনুষ্যশরীর লইয়া তুলনা করিলে জানা যায়, মাটী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, তাহাদিগের উপাদান রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, তাহাদের গুণ এবং জড়ত্ব তাহাদের ধর্ম্ম পৃথিবী সুমেরু অবলম্বন করিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, আর দেহ মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী নদ নদী দ্বারা নিজ জল নিকাশের পথ পরিষ্কার রাখিয়া তরল পদার্থ হইতে ভিন্ন রহে, আর দেহ শিরারূপ স্রোতস্বতী ধারণ

করিয়া মল, মূত্র, ক্লেদ হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছে। পৃথিবীর তরুরাজির শোভা দেহের রোমাবলীর ন্যায় এবং পৃথিবীর বন্ধুরতা ও জীবদেহের উচ্চনীচতার সমান। ভূগর্ভস্থ নানা প্রকার ধাতুর ন্যায় শরীরেও সপ্ত ধাতু বিদ্যমান আছে, আর পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে জীব সকল বাস করে, দেহেরও সকল স্থান জীবের দ্বারা পূর্ণ থাকে। আমরা যেমন পৃথিবী হইতে দেহ উপাদান প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং সেই পৃথিবীতে বাস করিয়া তাহা হইতে খাদ্য ও ভোগের বস্তু সংগ্রহ করি; মৎ-কুণাদি জীব সকল সেইরূপ আমাদের শরীর হইতে দেহ উপাদান প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই বাস করে।

আমরা যেমন পৃথিবীর সীমা ও তৎ-স্থিত জীব সকলকে জানি না, মৎকুণ ও উদরস্থ ক্রিমি সকল সেইরূপ দেহের

সীমা ও তদবস্থিত জীব সকলকে অবগত নহে। আমরা পৃথিবী হইতে মাটী, জল ও অগ্নি মাত্র পাইয়া থাকি, মৎকুণাদি জীব সকল দেহ হইতে মাংস, রক্ত ও তাপের অংশ সংগ্রহ করে। অপর, বায়ু হইতে চৈতন্য পর্য্যন্ত তত্ত্বগুলি আমরা যেমন দেহস্থ উপজীবকে দিতে পারি না, সেই রূপ পৃথিবী ও প্রাণবায়ু হইতে চৈতন্য-শক্তি পর্য্যন্ত বস্তু ভূলোকস্থ জীবকে দিতে পারেন না। পরন্তু আমরা যে স্থল হইতে ইচ্ছা, জ্ঞান, স্মৃতি প্রভৃতি বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি, পৃথিবী ও মৎকুণাদি জীব সেই স্থল হইতে ইচ্ছা, জ্ঞান, স্মৃতি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেহেতু মৃত্তিকামধ্যে অপ্রধানরূপে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল প্রভৃতি আছে; কিন্তু এই ভূতসমষ্টিমিলিত পৃথিবী যদি আমাদিগকে চৈতন্যশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিতে

পারিত, তাহা হইলে আমাদিগের দেহস্থ জীব সকলও আমাদের চৈতন্য ও ইচ্ছা লইয়া ব্যবহার করিত; তাহা যখন হয় না, তখন কি জীব, কি উপজীব, কি গ্রহ, কি উপগ্রহ যে একমাত্র পরমেশ্বরের প্রদত্ত চৈতন্যশক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে এবং তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্ট হইয়া স্থিতি করিতেছে ও যথাকালে প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

—*—
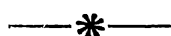
কর্ম্মফল ও কর্ম্মালোচনা

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কার্য্য করি, তাহা হইলে আমাদিগকে যে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, তাহা পরমেশ্বর ভোগ করেন না কেন? এ কথার উত্তর আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ইচ্ছা যখন আত্মাবলম্বন করিয়া থাকে, তখন একরূপ, বিজ্ঞান ও মন অবলম্বন করিয়া থাকিলে অন্যরূপ এবং প্রাণ, দেহ, স্ত্রী, পুত্রাদি অবলম্বন করিয়া থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। সুতরাং পরমেশ্বরের ইচ্ছা যে, প্রতি তত্ত্বে পড়িবার সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে

সন্দেহ নাই। আমি আত্মাস্বরূপ ধারণা থাকিলে আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, আমি দেহ, প্রাণ, মন স্বরূপ ধারণা করিলে সেরূপ ইচ্ছা হইবে না। সুতরাং আমরা পরমেশ্বরের ইচ্ছা লইয়া ব্যবহার করি বটে, কিন্তু চন্দ্রাদি উপগ্রহ যেমন সূর্য্য হইতে কিরণ লাভ করিয়া গ্রহান্তরে বিতরণ করে, সেইরূপ জীবসকল ঈশ্বরেচ্ছা হইতে ইচ্ছা করিবার শক্তি পাইয়া তাহা জড় পদার্থমধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকে। চন্দ্রকিরণের গুণ, শক্তি ও ক্রিয়া যেমন সূর্য্যকর হইতে ভিন্ন, সেইরূপ জীবের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হইলেও কার্য্যতঃ পার্থক্য আছে। সেই জন্য অহংকর্ত্তাভিমানযুক্ত জীব যে ইচ্ছা করিয়া কর্ম্ম সঞ্চয় করে, সে কর্ম্মের ফল জীবকেই ভোগ করিতে হয়, পরমেশ্বর সে কর্ম্মসঞ্চয় বা তাহার ফলভোগ করেন

না। আত্মার ইচ্ছা পূর্ণ আর অন্ধকার-মিশ্রিত আলোকের ন্যায় ভ্রমসংযুক্ত মনের ইচ্ছা অপূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ পদার্থে যোগ করিলে পূর্ণ হয়, আর জড় পদার্থে যোগ করিলে যাহা ছিল তাহাও বিকৃত হয়। অতএব মায়ার অন্তর্গত যে অসম্পূর্ণ ইচ্ছা আমাদের আছে, তাহার সার্থকতা করা চাই, তাহা হইলে মায়ার অতীত ইচ্ছাশক্তিতে আমাদের অধিকার হইবে এবং তখনই ঈশ্বরের ইচ্ছায় কার্য্য করিতেছি বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত পরমেশ্বরের ক্ষণিক সৃষ্টির ইচ্ছাকে প্রকৃতি বলে। সেই ইচ্ছাময়ী প্রকৃতি যদিও অনন্তব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের কারণ, তথাপি তাহা দেহস্থ তিলের ন্যায় পরম পুরুষের একদেশব্যাপী হইয়া ভিন্নাকারে অবস্থান করেন। শরীরকে লইয়াই

যেমন তিল, সেইরূপ পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃতি, আর তিলের মধ্যেও যেমন চেতনার সঞ্চার থাকে, সেইরূপ সৃষ্টি-প্রকৃতির সর্ব্বস্থানে পুরুষের সত্ত্বা আছে, কিন্তু তিলাতীত শরীর ও চৈতন্যের ন্যায় পরম পুরুষের সর্ব্বাঙ্গে সৃষ্টিপ্রকৃতি নাই। এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, সৃষ্টিপ্রকৃতির প্রতি আসক্ত পুরুষের ইচ্ছা এবং সৃষ্টিপ্রকৃতির অতীত পুরুষের ইচ্ছা এক নহে। সুতরাং আমরা পরম পুরুষের ইচ্ছায় কার্য্য না করিয়া বিকৃত সৃষ্টিপ্রযুক্ত পুরুষের ইচ্ছায় কার্য্য করি, সুতরাং সৃষ্টিপ্রকৃতিযুক্ত পুরুষ বা জীবকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। সৃষ্টিপ্রকৃতির ইচ্ছায় জীবের চেষ্টা জন্মে, আর সৃষ্টিপ্রকৃতি-যুক্ত পুরুষের ইচ্ছায় জীবভাগ্য জন্মিয়া থাকে। বাল্যকালের ধূলাখেলা হইতে

আরম্ভ করিয়া মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, সমাজ ও সংসার প্রভৃতি লইয়া যে কর্ম্ম, সে সমুদায় পুরুষকার দ্বারা আচরিত হয়। আর এই সমুদয় কর্ম্মের যে স্মৃতি এবং বিস্মৃতির অন্তর্গত স্মৃতি তাহাকে কর্ম্মসংস্কার বা ভাগ্য বলে।

বহুকাল ধরিয়া মনুষ্য সকল যাহা করে তাহা স্মরণ থাকে; যে কর্ম্ম আসক্তির সহিত আচরিত হয়, তাহা সমধিক স্মরণ থাকে; আর যে কর্ম্মে চিত্ত নিমগ্ন হয়, তাহা ভুলিয়াও ভুলিতে পারে না। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুআদি চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু সেই সকলের স্মৃতি জীবনব্যাপী। এই প্রকার নিজদেহও স্থায়ী নহে, কিন্তু তাহাও আচরিত কর্ম্ম-সংস্কার বহুজীবনেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুর পর যে জন্ম হয়, তাহাতে পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি থাকে না; কিন্তু জন্মা-

স্তরে যে জীব যে বয়সে যে কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার বর্ত্তমান জন্মে সেই বয়সে সেই কর্ম্মে ইচ্ছা হইবে এবং সেই কার্য্যেরই সুবিধা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাকে পূর্ব্বভাগ্য বা দৈবসংযোটন বলে। জীব বহুজন্ম ধরিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছে, সেই কর্ম্ম-সমষ্টির একত্র সমাবেশে বর্ত্তমান জন্ম এবং তদুপযুক্ত ভোগ সংযোজিত হইয়াছে। এই জন্মে চেষ্টা দ্বারা যদি কুকর্ম্ম নিরোধ ও সৎকর্ম্মসঞ্চয় না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মও বর্ত্তমানের অনুরূপ হইবে, কিন্তু মানুষ যে বিষয়ে ইচ্ছা করিতেছে, যে কার্য্যে সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে দৈব আকর্ষণশক্তি বিদ্যমান থাকিলেও বর্ত্তমান জন্মের সঙ্গে শিক্ষা ও কালোপযোগী বুদ্ধি দ্বারা যে চেষ্টা জন্মে, তাহার ফলে ভাগ্য পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়া থাকে।

কাজেই পুনঃ পুনঃ এক রকম আকার, এক-প্রকার মন ও একই রকম বাক্যবিশিষ্ট মানুষ জন্মে না এবং এই হেতুই মৃত ব্যক্তির আকারের অনুরূপ লোক জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং চেষ্টা দ্বারা যে দৈবপ্রতীকার হয় না, তাহা নহে। কিন্তু যে স্থলে শত শত চেষ্টা বিফল দেখা যায়, অনিচ্ছায় অনিষ্ট সংঘটন, বিপদ্, ভয়, অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত হয়, সে স্থলে পূর্ব্বকৃত পাপ প্রবল দুঃখ-ভোগের অবস্থা বলিতে হয়, তাহার প্রতীকার জন্য যদি প্রবল চেষ্টা করা যায়, সেই ঐকান্তিকতা বিশ্বাস, জপ, হোমাদি ক্রিয়াকলাপ সময় অনুসারে সুফল দিতে পারে এবং কর্ম্ম পরিবর্ত্তনের জন্য তাহার মনে তৎক্ষণাৎ শান্তিও উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন প্রারব্ধ ভোগ খণ্ডন হয় না

অত্যুৎকট পাপ পুণ্য যে সঙ্গে সঙ্গে ফলিতে পারে না, তাহা নহে, কিন্তু যে কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি, তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বর্ত্তমান কর্ম্ম প্রবল হওয়া চাই; নতুবা পূর্ব্বভোগ্য কর্ম্মই বর্ত্তমান কর্ম্মকে বাধা দিতে পারে। সেই জন্য অনেকস্থলে পাপকারী ব্যক্তির সুখ ও পুণ্যকারী ব্যক্তির দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাপ কার্য্যকে অসতের এবং পুণ্যকার্য্যকে সতের কার্য্য বলে। পাপের দ্বারা দুঃখ এবং পুণ্যের দ্বারা সুখ হয়। দুঃখভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়, আর সুখভোগ করিলে পুণ্য নিঃশেষ হয়। সেই জন্য চিরদিন সুখ বা দুঃখ থাকে না। নানারূপ কর্ম্ম দ্বারা কখন পাপ, কখন পুণ্য, কখনও বা উভয় মিশ্রিত কর্ম্ম সঞ্চয় হইতেছে, সুতরাং দুঃখ, সুখ বা উভয় মিশ্রিত ফলভোগের বিরাম হয় না।

পরোপকারজনক কর্ম্মকে পুণ্য বলে, আর যে কর্ম্মে পরের ও নিজের কায়মনোবাক্যে পীড়া উৎপাদন করা হয়, তাহাকেই পাপ বলে। দেহ, ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মন দ্বারাই এ কার্য্য সাধিত হয়। সুতরাং যে যে অঙ্গ যে যে কার্য্য সাধন করে, তাহার সেই সেই অঙ্গই আচরিত, সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিবে। মানসিক পাপের ফলে মনঃকষ্ট, বাচনিক পাপদ্বারা বাক্য-যন্ত্রণা, আর দেহ কর্ত্তৃক আচরিত পাপের ফল দেহকেই ভোগ করিতে হয়। এই রূপ কায়মনোবাক্যের পুণ্য দ্বারা ঐ সকল অঙ্গই সুখী হইতে পারে। আমি যদি নিজের সুখের জন্য অপরের অসুখ বিধান করিয়া থাকি, নিজের মঙ্গলের জন্য অন্যের অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকি, নিজে শান্তি পাইবার জন্য ও ভয়শূন্য হইবার জন্য অন্যের অশান্তি বা ভয়

উৎপাদন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে উক্ত পাপের ফলে অশান্তি, উৎপীড়ন, ভয় পাইতে হইবে। ইহা ভিন্ন যদি কেহ নিজের সুখ দৃষ্টি না করিয়া পরের সুখ বিধান করেন, নিজের অমঙ্গল সত্ত্বে পরের মঙ্গল করেন, নিজের অশান্তি ও ভয়সত্ত্বেও অপরকে শান্তি ও অভয় দান করেন, তিনি যে স্বর্গোচিত পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, তাহাতে অসীম সুখ প্রাপ্ত হইবেন। ঘাত প্রতিঘাতের ন্যায় এ সকল কার্য্যের ফলসংযোগ হইয়া থাকে, আমি সাধারণ জীব হইতে ভেদবুদ্ধির দ্বারা যে বিপরীত আমিত্ব সৃষ্টি করিয়াছি, তৎসাহায্যে কর্ম্ম করিলে সেই বিপরীত আমিত্বের ফলও বিপরীত না হইবে কেন? সেই জন্য আত্মস্বার্থ অন্বেষণে বিনাশজনিত দুঃখ, এবং আত্মত্যাগ স্বীকারে প্রাপ্তিজনিত সুখ ঘটিয়া থাকে।

আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মের সঙ্গেই যখন ফলকামনা আছে, তখন বর্ত্তমান কর্ম্মফল যদিও পূর্ব্ব কর্ম্মফলের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইবার কথা, কিন্তু অগ্রের আচরিত কর্ম্ম-গুলি ভোগ হইয়া গেলে পরের কর্ম্মগুলি ক্রমশঃ ভোগ হইবে। আবার এক কর্ম্ম-ভোগ হইতেছে, অপর কর্ম্ম সঞ্চয় হইতেছে, অতএব সমুদয় কর্ম্মফল ক্ষয় হওয়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ আয়ু লইয়া জীব-সকল বিদ্যমান আছে, মৃত্যু ইহাদের অবধি নহে। আমরা এই জন্মকে আদ্যও অন্ত ভাবিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকি, সেই জন্য কর্ম্মবিচার করি না, কিন্তু প্রত্যেক কর্ম্মের ফলেই অনন্ত জীবভেদ হইয়াছে।

একই প্রকারের বৃক্ষ, লতা, পশু, পাখী, সরীসৃপ, মনুষ্য, গ্রহ, নক্ষত্র লইয়া পৃথিবী নহে। যত প্রকার জীব, তত প্রকার আকার, চলন, বলন, ব্যবহার, মত-

ভেদ নীতিভেদ প্রভৃতি আছে। জড়বুদ্ধি জীব অপেক্ষা কুবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ, কেন না, কুবুদ্ধি ঠেকিয়া শিখিয়া সংবুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু জড়বুদ্ধিযুক্ত জীব যে কর্ম্মে যাতনা পায়, তাহাই পুনঃ পুনঃ আচরণ করিয়া থাকে। মনুষ্য মধ্যে সংবুদ্ধি, কুবুদ্ধি ও জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক আছে। জড়বুদ্ধি দ্বারা অলস, অকর্ম্মণ্য, দীর্ঘসূত্রী ও বিষাদযুক্ত হইতে হয়, কুবুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল, অস্থির ও পাপপরায়ণ হইতে হয়, আর সংবুদ্ধির দ্বারা ধীর, স্থির, শান্ত, সুখী ও মহানুভব হইয়া থাকে, সুতরাং সকল জীবের ভাবই এক মনুষ্যমধ্যে বিদ্যমান দেখা যায়; সেই জন্য মনুষ্য ক্ষুদ্র হইতে অতিক্ষুদ্র ও বৃহৎ হইতে সুবৃহৎ হইতে পারে, একজন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে এক ধারে রাখিয়া অপর ধারে মনুষ্য হইতে যাবতীয় প্রাণীকে রাখিয়া

তুলনা করিলে সেই অসীম জীবের তুলনায় জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকেই পূর্ণ বলা যায় ; কিন্তু কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান্, কি অবিদ্বান্, কি গুণবান্, কি গুণহীন কেহই পূর্ণ নহে। কেননা, সকলেরই বাসনা আছে এবং সেই বাসনার বিফলতা আছে। মনুষ্য যে অন্য প্রাণীর তুলনায় পূর্ণ তাহাও বলা যায় না ; যেহেতু বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিতে পারে, পক্ষিকুল আকাশে উড়িতে পারে, সর্প ও ভেক আদি জন্তু বহুদিন অনাহারে থাকিতে পারে, পশুদিগের মধ্যে অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পশুও অনেক, সুতরাং কেহই কোন প্রাণীর তুলনায় পূর্ণ নহে। স্বীকার করিতে হয়, অন্য অন্য প্রাণীদিগের কষ্ট ও অভাব মনুষ্য অপেক্ষা বেশী, কিন্তু সেই দুঃখ প্রাপ্তি দ্বারা পাপক্ষয় হইলে প্রকৃতি কর্ত্তৃকই

তাহাদের উচ্চগতি সাধিত হয়, কিন্তু মনুষ্য যে মস্তিষ্ক পাইয়াছে, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া পশুধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, তাহার বাসনা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকার ও ভোগ পরিবর্ত্তন না হইবে কেন ? সুতরাং মনুষ্যজাতি অন্য কোন জীবের তুলনায় পূর্ণ হইবে কিরূপে ?

স্থলে, জলে, অগ্নিতে, আকাশে, অহংতত্ত্বে ও মহত্তত্ত্বে জীব সকল পূর্ণ আছে। জীবদেহের শোণিতে শুক্রেও অসংখ্য জীবের বাস দেখা যায়। ইহার মধ্যে মনুষ্যও একটী জীব। অনন্তের এক বিন্দু লইয়া সৃষ্টিপ্রকৃতি, আর সৃষ্টিপ্রকৃতির এক বিন্দু লইয়া জীব ; সুতরাং কোন জীবই পূর্ণ নহে। অপূর্ণ জগতের জীব সকল, অপূর্ণ মঙ্গল, অপূর্ণ সুখ, অপূর্ণ স্বার্থ, অপূর্ণভয়, অপূর্ণেচ্ছা না হইবে কেন ? অতএব সকল জীবেরই

অভাব আছে। পুণ্যবান্ জীব যে মনে করিবেন "আমার প্রতাপে শীত, উষ্ণ, বর্ষা, বায়ু, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষাদি ক্ষান্ত হইবে" তাহার উপায় নাই। ইহা ভিন্ন জন্ম ও মৃত্যু কষ্ট সকল জীবেরই আছে। আবার সুরূপ, কুরূপ, সুশব্দ, দুঃশব্দ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সুস্বাদ, বিস্বাদ, সুখস্পর্শ ও অসুখস্পর্শ বস্তু যখন আছে, তখন কেবল উত্তমটি ভিন্ন অধমটি ব্যবহার করিব না, তাহা বলা যায় না, কেন না, আজি যাহা উত্তম, কাল তাহা অধম বোধ হয়, আমার নিকট যাহা উত্তম, অন্যের নিকট তাহা অধম হইয়াও থাকে। এইপ্রকার প্রিয়সংযোগে আসক্তি, অপ্রিয়সংযোগে বিরক্তি সকলেরই আছে; আর ভোগ দ্বারা যখন পাপ পুণ্য ক্ষয় হইতেছে, তখন আসক্তি বা বিরক্তির বস্তুই বা স্থায়ী হইবে কেন? সুতরাং কেহই পরিতৃপ্ত

হইতে পারে না; অথচ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, আত্মীয়বিয়োগজনিত কষ্ট, হিংসা, নিন্দা, অযশ, পরাধীনতা প্রভৃতি হেতু কষ্ট, শীত, গ্রীষ্ম, সংসার ও সমাজ লইয়া কষ্ট কোন লোকেরই না থাকিবে এমন নহে; সুতরাং কষ্ট নিবারণ জন্য চেষ্টা সকলেরই হয়, এবং সেই চেষ্টার বিফলতাও হইয়া থাকে। যে সুখপ্রাপ্তির জন্য ও দুঃখনাশের জন্য আমরা এত কর্ম্ম করিতেছি, সেই দুঃখ ও সুখবোধটিও ভ্রম মাত্র। আমি লক্ষ টাকা পাইব বলিয়া আশা আঁকিলাম, সে স্থলে দশ হাজার পাইলে সে প্রাপ্তিতে নিরাশা-জনিত দুঃখ হইবে; আবার রাজা প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা করিয়া যদি হস্তকাটিয়া মুক্তি প্রদান করেন, সেই নাশেও আশাজনিত সুখ হইবে। সুতরাং আমাদের সুখ দুঃখ বোধ যে দেহাত্মবোধের অনুরূপ

মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় যাঁহারা সুন্দর রূপে অনুভব করেন, তাঁহারা সংসারের অতি আনন্দেও দুঃখ দেখিয়া থাকেন, অতি বিজ্ঞানেও অজ্ঞানতা দেখিয়া থাকেন, সম্পূর্ণ স্বভাবেও অভাব বোধ করেন, সুতরাং দুঃখ সুখপ্রদ কর্ম্মে তাঁহাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। আর বৈরাগ্য জন্মিলে কর্ম্ম সঞ্চয় রহিত হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত কর্ম্মভোগ ক্ষান্ত হয় না। সেই জন্য সাধনপ্রবৃত্তি ও পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভরতা জন্মে, এ সময় সাধন দ্বারা জীবের ইচ্ছার বিরাম হয় বলিয়া পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আত্মজ্ঞ জীব চালিত হইয়া থাকেন। পরমেশ্বর পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাও পূর্ণ। এই জন্য তাঁহার ইচ্ছায় নির্ভরশীল জীবও ক্রমশঃ আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, মন ও বিজ্ঞান নহি বলিয়া পূর্ণ হইয়া থাকেন।

এই আত্মনিশ্চয় কার্য্য সাধন হইলে পুরুষকার ও দৈবদত্ত ফল, ভোগী অভাবে ভোগ্যের ন্যায় ক্রমে বিফল হইয়া অন্তর্দ্ধান করে, সুতরাং বিধাতার কলম অন্যথা হইয়া থাকে। কেন না, পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখের সীমা আছে, তাহাদের সীমার বাহিরে যে জীব গিয়াছেন, তাঁহাকে ধরিবার শক্তি অভাবে পাপ পুণ্য বিরত হইয়া থাকে। সৃষ্টিপ্রকৃতি যেমন অনন্ত পুরুষের একদেশ মাত্র, দেহাসক্ত জীব সেইরূপ সৃষ্টিপ্রকৃতির এক বিন্দু মাত্র; সুতরাং দেহাসক্ত ব্যক্তিই পাপপুণ্যের অধিকারমধ্যে বাস করে। যাঁহার দেহাসক্তি নাই, অথচ দেহ আছে, তাঁহাকেও যে সুখ দুঃখ আক্রমণ করে না তাহা নহে; কিন্তু ভক্ত হরিদাস যেমন হিতাহিত জ্ঞানরহিত কাজির অনুচরগণ কর্ত্তৃক বাইশ বাজারে

প্রহার নির্য্যাতনভোগ করিয়াও অন্যমনস্ক থাকিতে পারিয়াছিলেন, ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ যেমন হিরণ্যকশিপুর কঠোর শাসনেও উদ্বেগশূন্য রহিয়াছিলেন, সেই প্রকার সুখদুঃখে সমদর্শী আত্মজ্ঞ পুরুষের দেহকষ্ট হইলেও সে কষ্ট তাঁহার অন্তঃকরণকে বিচলিত করিতে পারে না। এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কোন প্রকার কামনা থাকে না। যাঁহার কামনা নাই, তাঁহার অভাবও নাই, সুতরাং তিনিই পূর্ণ। এই পূর্ণপুরুষের দেহত্যাগ হইলে তিনি সীমাবদ্ধ না হইয়া বিরাট্ পুরুষের অঙ্গীভূত হইয়া থাকেন। যাঁহার অভাব, সংকল্প, কামনা ও আসক্তি জীবনসত্ত্বে ছিল না, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। কিন্তু তিনি পরমপুরুষের প্রতি ভক্তি, প্রেম মহাভাবাদি পোষণ করিয়াছিলেন,

সেই জন্য সৃষ্টিপ্রকৃতির অতীত হইলেও পরাপ্রকৃতির মধ্যস্থ থাকেন। সুতরাং সেই মহাভাববিশিষ্ট ইচ্ছাময় পুরুষের অবতাররূপে প্রকাশ হইবার কোন বাধা থাকে না। কেননা, তাঁহার যখন দেহ ছিল, তখন দেহের প্রতি বিরক্তি ছিল না, সেই জন্য দেহ অসিদ্ধ না হইয়া তাঁহার ইচ্ছার অপেক্ষায় সংযত ও সিদ্ধ রহিয়াছে। আর দেহ সত্ত্বে আসক্তি ছিল না বলিয়া দেহ তাঁহাকে বাধ্য করিয়া নিজ অধিকারস্বরূপ মৃত্তিকায় আনিতে পারিতেছে না। ইহাকেই বিদেহমুক্তি বলে।

বিদেহ ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে দেহ, প্রাণ, মন খাটাইয়া কার্য্য করেন নাই, সেই জন্য তাঁহার দেহ, প্রাণ, মন, অক্ষয়রূপে সংযত আছে। আমরা যে শক্তিকে মাত্রার অধিক খাটাইয়া কার্য্য করি, তাহা খাটিতে খাটিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ণ

হয় ; সেই জন্য সে শক্তিকে বিশ্রাম দিতে হয়। ইহা সুষুপ্তি, মৃত্যু ও প্রলয়ের অবস্থা। কিন্তু যে শক্তি অধিকার সত্ত্বে কার্য্য করে নাই, তাহা অক্ষয় ও পূর্ণ আছে। সুতরাং সেই পূর্ণশক্তি ইচ্ছার অভাবে সংযত ও নিরুদ্ধ থাকিয়া ইচ্ছামাত্রেই বাঞ্ছিত কার্য্য উদ্ধার করিতে পারে। চক্ষু রূপ দেখিয়া ক্লান্ত না হইলে প্রকৃত রূপের বিচার করিতে পারে, মন চিন্তা কর্ত্তৃক অবশ না হইলে কারণ অনুসন্ধান করিতে পারে। সেইরূপ জীবিতকালে যিনি সর্ব্বশক্তিকে সংযত রাখিয়াছেন, তিনি মৃত্যুর পর সৃষ্টিপ্রকৃতির তুলনায় সর্ব্বশক্তিমান্ থাকিবেন। সুতরাং তিনি বিদেহ হইয়া বিরাট্ পুরুষে মিলিত থাকিলেও তাঁহার দেহধারণশক্তির অভাব হয় না। সৎব্যক্তির অসৎকর্ম্ম করিবার শক্তির ন্যায় তাঁহার দেহ-ধারণশক্তি

সংযত থাকে মাত্র। আর মুক্ত পুরুষের ভক্তি, প্রেম, আনন্দাদি অপ্রাকৃত শক্তি উপভোগ্য, এই সকল শক্তি প্রয়োগ করেন বলিয়া তিনি পরম পুরুষের তুলনায় অপূর্ণ আছেন। এই জন্য সৃষ্টিপ্রকৃতি বা মায়ার নিয়মে তাঁহার জন্ম না হইলেও পরাকৃতি বা মহামায়ার নিয়মে তাঁহার জন্ম হইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

—⁕—

অবতারতত্ত্ব ও সাধনসূত্র

যে আত্মা সংস্কারবশতঃ ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া জন্মেন, তিনি জীব, আর যিনি সংস্কারহীন অথচ আবশ্যকমত স্থানে স্বইচ্ছায় জন্মেন, তাঁহাকে অবতার বলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতির পূর্ণতা লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে পাপের মূর্ত্তি বা অসুরের অবতার বলা যায়। এই প্রকার অহিংসা, অক্রোধ, সত্য, ক্ষমা, দয়া, সরলতা প্রভৃতির পূর্ণাংশে যাঁহারা জন্ম-গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের মূর্ত্তি বা দেবতার অবতার বলা হয়। অসুর মায়া-বলে দেবতাকে পরাভূত করিবার চেষ্টা

করিয়া থাকে, আর দেবতা আত্মশক্তিতে তাহাদিগকে বাধা দিয়া থাকেন। এই রূপ বিবাদে যখন অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়পথ নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তখন দেব-গণের ব্যাকুলতাপূর্ণ সংযমিতভাব মহা-ভাবে আঘাত করে, সেই আঘাতের প্রতিঘাত স্বরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মার যে অংশ স্বেচ্ছায় অবনীতে আগমন করেন, তাঁহাকেই অবতার বলা যায়।

অনন্ত জগৎ নিয়মাধীন। দগ্ধস্থানের বায়ুর অভাব পূরণের জন্য ভিন্ন বায়ুর গতি যেমন একটী নিয়ম, আত্মশক্তি-লঙ্ঘনকারী অহঙ্কারীকে দমন করিবার জন্য আত্মার মূর্ত্তিধারণ সেই প্রকার একটী নিয়ম।

কোকিল কাকের বাসায় ডিম ছাড়িয়া যায়, আর কাক চিনিতে পারিলেই কোকিল শাবককে মারিতে যায়, ইহাই

উভয়বিধ পক্ষীর স্বভাব, সুতরাং ইহা স্বভাবের কার্য্য বলিয়া অনিয়মিত। কিন্তু কোকিল-শাবক আত্মরক্ষায় সক্ষম না হইলে কাক তাহাকে চিনিতে পারে না, ইহা স্বভাবাতীত ঈশ্বরের সুব্যবস্থা। মায়ার নিয়ম যেখানে অসম্পূর্ণ, ঈশ্বরের নিয়ম সেখানে পূর্ণ। মায়া নিজে অপূর্ণা বলিয়া ঈশ্বরের নিয়ম অন্যথা করিয়া থাকে, সুতরাং জগতের সাধ্যাতীত অনিয়মে নিয়ম স্থাপন করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে ঈশ্বরকে অবতাররূপে প্রকাশ হইতে হয়। ঈশ্বরের স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে নিজশক্তি প্রেরণ করিবেন, অথবা আবশ্যক হইলে অংশ বা পূর্ণ-শক্তিমান্ রূপে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি জগতের আবশ্যকে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, আবার শাকম্ভরী অবতারে শাক হইয়া বহু কালব্যাপী

দুর্ভিক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভ যেমন পাপের অবতার, কালী তারা সেই প্রকার মহাবিদ্যার অবতার। হিরণ্যকশিপু যেমন অহঙ্কারের মূর্ত্তি, নৃসিংহদেব সেই প্রকার আত্মার প্রকাশ। যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেই খানে সেই প্রকার ব্যবস্থা। জীব যেমন সময়ে আত্মার প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করে, ঈশ্বরও সেইরূপ যথাকালে জীবের প্রতি দয়া করিয়া আদর্শদেহ ধারণ করেন। অন্নময়দেহী জীব যেমন এই লোকে থাকিয়া দেহ, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানের আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কেবল আনন্দময় আত্মায় লক্ষ্যবিশিষ্ট হইলে অন্যলোক ভ্রমণ না করিয়াও সত্যলোকে যাইতে পারেন, সেই প্রকার সত্যলোকাধিপতি বিরাট্ পুরুষ দেহ লক্ষ্যবিশিষ্ট হইলে অন্যলোক ভ্রমণ না করিয়াও মর্ত্ত্যলোকে

আসিয়া বাঞ্ছিত মূর্ত্তিধারণ করিতে পারেন এবং এখানে আসিয়া দেহসম্বন্ধ হেতু যদিও কোন কোন অংশ অবতারের আসক্তি জন্মে বটে, কিন্তু সময়বিশেষে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি পূর্ব্বভাব পূর্ব্বাচরণ জীবের দৈবশক্তির ন্যায় জাগরিত হয় বলিয়া পুনরায় সেই সত্যলোকেই গতি হইয়া থাকে। পুণ্যবান্ জীবের ন্যায় নানাদশা ও পুনর্জ্জন্ম ভোগ হয় না। আমরা যেমন নিদ্রার পূর্ব্বে অমুক সময়ে জাগরিত হইব বলিয়া দৃঢ়সংকল্প করিলে নিয়মিত সময়ে চেতনা লাভ করিয়া থাকি, সত্যসংকল্প ভগবান্ অবতারকালে আবার আসিব বলিয়া সংকল্প করেন, কাজেই যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার সম্ভব হইয়া থাকে।

রজ, সত্ত্ব, সুদ্ধসত্ত্ব এবং গুণাতীত পরমপুরুষের ভাব অবতারমধ্যে প্রকাশ

হয়। যিনি জন্মকাল হইতে মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত কখনই কোন রকম ভ্রমের বশীভূত নহেন, তিনিই পূর্ণাবতার।

পরমেশ্বর সত্ত্বমধ্যে তমোরূপে এবং তমোমধ্যে সত্ত্বরূপে থাকিতে পারেন, সুতরাং মায়ার মধ্যে আসিলে তাঁহার যে পূর্ণত্ব নষ্ট হইবে এরূপ নহে। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষরূপে যেখানে যে প্রয়োজন তাহাই ব্যবস্থা করিবার জন্য স্থূল-সমষ্টিস্বরূপ পর্ব্বতে পার্ব্বতীদেবীর ন্যায়, জলসমষ্টি স্বরূপ সাগরে লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় এবং নৃসিংহাদি অবতারের ন্যায় সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান আছেন। তিনি স্বীয় ভক্তগণকে রক্ষা না করিলে তাঁহার অসাধারণ ভাবের অভাব হইত, সেই জন্য জড়ভরতকে চোরের হস্তে রক্ষা করিতে—জটিলকে দীনবন্ধুরূপে দেখা দিতে সর্ব্বত্র প্রস্তুত থাকেন। আমাদের

সমাধিলাভ যেমন অসাধারণ, পরমেশ্বরের দেহ ধারণ সেই প্রকার অসাধারণ। অনন্তের ভক্তগণের অসাধারণত্ব যখন বিদ্যমান, তখন পরমেশ্বরের অসাধারণত্ব না থাকিবার কারণ দেখা যায় না। যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা হয়, তাঁহার দেহধারণশক্তির অভাব বলা নিতান্তই অসঙ্গত। মায়াধিষ্ঠিত ব্রহ্মাদি দেবতা সকল একের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের অনিষ্টের কারণ সৃষ্টি করিলে, অথবা তত্ত্ব ও জীবের স্বভাব অনিয়মিত হইলে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাহা রক্ষায় সমর্থ হয়, সুতরাং সেই স্থলেই পরমেশ্বরের অবতার গ্রহণ আবশ্যক হইয়া থাকে। সেই অবতারকালে যদিও তাঁহার দেহ সীমাবদ্ধ হয় বটে, কিন্তু অহংব্রহ্মাস্মি বোধ থাকে, সেই জন্য তাঁহাকে অপূর্ণ বা সসীম বলিতে পারা যায় না। ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ পূর্ণাবতার বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। যেহেতু তিনি দেহসত্ত্বে বিদেহ হইতে পারিতেন, একরূপ সত্ত্বে সর্ব্বরূপ ধরিতে পারিতেন, অসীম দূরের ডাক শুনিয়া দয়া করিতে পারিতেন, অনন্ত জন্মের কথা তাঁহার সুবিদিত ছিল, তাঁহার দেহ বাক্য, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ পরিপূর্ণ ছিল, এবং বহু আসক্তির বস্তু সংযুক্ত থাকিয়াও অনাসক্ত থাকিতেন। তিনি বালকগণের নিকট আমোদপ্রিয় বালক, যুবতীগণের নিকট মনোহর আনন্দ-পূর্ণ যুবক, এবং মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধগণের নিকট ত্রিকালজ্ঞ বহুদর্শী বলিয়া পরিচিত থাকিতেন। তাঁহার রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় ছিল, তিনি মৃত জনের প্রাণ দিতেও সক্ষম ছিলেন, শত্রুও তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইত। সীমাবদ্ধ জীব নিয়মাবদ্ধ অসীম ভগবান্ কি:নিয়মের বাধ্য

হইবেন, সেই জন্য গোবর্দ্ধন ধারণে, কালীয় দমনে, দাবানল ভক্ষণে ও গোপীর বাঞ্ছিত পূরণে তাঁহার অধিকার। সর্ব্ব-দোষশূন্য সর্ব্বগুণবিভূষিত, সর্ব্বশক্তি-মান্ মানুষ দেখিলে কে তাঁহাকে ভাল-বাসিতে ইচ্ছা না করে? সুতরাং গোপী-দিগের কৃষ্ণপ্রীতি অস্বাভাবিক নহে। আর একের অলৌকিক ভালবাসা পাইয়াও অন্যের প্রেম অপ্রকাশ সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে যে যে ভাবে চাহিয়াছিল, সে সেই ভাবেই পাইয়াছে। গোপীগণ যদি তাঁহার প্রেম না পাইত, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হইত। গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণের জন্য দেহ, গৃহ, স্বজন ভুলিয়া কঠোর সাধনার দ্বারা কাত্যায়নী ব্রত করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক তাঁহাকে পতি পাইয়া ছিলেন, আর রাসক্রীড়ার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ

গোপীগণকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "আমি দেহী বলিয়া তোমরা আমার সঙ্গলালসা করিও না, আমাকে আত্ম-স্বরূপ জানিও।" এই সকল গুহ্যলীলা যোগমায়া দ্বারা এতই গোপনে হইয়াছিল যে, শুকদেব ভাগবত-বর্ণনকালে প্রকাশ না করিলে, তাহা জগতের অগোচরেই থাকিত। সুতরাং ইহা সমাজ-কলঙ্ক বা আদর্শের হানিকর নহে, ভক্তের প্রেম পাইয়া আত্মার প্রীতিপ্রকাশমাত্র।

পরমা সাধিকা শ্রীরাধিকা পরমাত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে এতই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে মহাভাবের অবতার বলিতে হয়। ভগবানের ভক্ত কতদূর তাঁহাতে আসক্ত এবং ভগবান্ নিজভক্ত-গণকে কতদূর ভালবাসেন, বৃন্দাবন-লীলাতে এ দুইটীর চরম আদর্শ দেখা যায়, অতএব উপযুক্ত মাতা, পিতা, সখা,

দাস, প্রণয়িনীগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতার জগতের জীব আকর্ষণের মহামন্ত্রস্বরূপ। মানুষের আদর্শ সম্পূর্ণ মানব ভিন্ন দেবতাও নহে। শম, দম, জ্ঞান, বৈরাগ্য-বিশিষ্ট একজন লোক দেখিলে মানুষ যত শিক্ষা পায়, চিরদিন পুস্তকে পড়িয়া বা জনশ্রুতি শুনিয়া সেরূপ শিক্ষা হয় না। সুতরাং কালে কালে, দেশে দেশে আদর্শ অবতার সম্ভব হইয়াছে ও হইবে। ঈশ্বরকে লোকে ভয়ে ভক্তি করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ নিজে ভালবাসিয়া সকলকে ভালবাসিবার অধিকার দিয়াছিলেন। কালীমাতা অসিদ্বারা সর্ব্বনাশ করিয়া স্বীয় পদে স্থান প্রদান করেন, আর শ্রীকৃষ্ণ বংশী দ্বারা সর্ব্বনাশ করিয়া পরম গতি দিয়া থাকেন। ইহাই উভয় সর্ব্বনাশের বিশেষত্ব। যে সকল অবতার দেহসত্ত্বে বিদেহ হইতে পারিতেন, তাঁহারা

যে, বিদেহ থাকিয়া দেহধারণ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারকালে যেমন ভক্তের দর্শন বাসনা সফল হইতে পারিত, এখনও সেরূপ হইবার বাধা নাই। জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতে যে ভক্তের অধিকার, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেও সেই ভক্তের অধিকার আছে। তাঁহার কৃপায় জ্ঞানের সফলতা হইতে পারে, আর ইন্দ্রিয়ের সফলতা হইতে পারে না, এরূপ নহে। অতএব যতদিন সাধকের দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে, ততদিন সাকার চৈতন্য-ঘনমূর্ত্তির উপাসনাই প্রশস্ত। যাঁহার ইচ্ছায় জীব সকল সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার অনিচ্ছায় সৃষ্টির অতীত হইতে কাহারও সাধ্য নাই, সুতরাং সাধনের দ্বারা পরমেশ্বরের দয়া আকর্ষণ সাধক-মাত্রেরই প্রয়োজন।

কতকগুলি জড়শক্তি আত্মলাভের প্রতিকূল, আর কতকগুলি চৈতন্যশক্তি আত্মলাভের অনুকূলভাবে দেহমধ্যে বিদ্যমান আছে। প্রতিকূল শক্তিগুলিকে অনুকূল শক্তির দ্বারা বশীভূত করিতে পারিলেই সাধনের বাধা দূর হয়। অতএব বিনয় ও দীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক অহঙ্কারকে সংযত করিবে। এই প্রকার বস্তুবিচার দ্বারা কামকে, ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সন্তোষ দ্বারা লোভকে, বাক্য-সংযম দ্বারা মিথ্যাকে, তত্ত্বদর্শন দ্বারা ভয়কে এবং ধৈর্য্য দ্বারা সকল রকম পাপকে জয় করিতে হয়। সাধকব্যক্তি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে হাস্যমুখে সম্ভাষণ করিবেন, কটুভাষীকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, অপকারীর প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিবেন এবং তাড়নাকারীর নিকট স্বীয় দোষ স্বীকার করিবেন। ভগবৎলাভ পক্ষে

অনুকূল দ্রব্যের গ্রহণ ও তৎপ্রতিকূল দ্রব্য পরিত্যাগ, পরমেশ্বর সকল অবস্থায় সহায় থাকিয়া রক্ষা করিবেন, এরূপ বিশ্বাস, আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার কৃপালাভের অপেক্ষায় থাকিয়া কালযাপন এবং ত্রৈলোক্যের আধিপত্য পাইলেও অভীষ্টদেবের চরণ হইতে বিচলিত না হওয়া শরণাগতের লক্ষণ। বীজমন্ত্র বা ভগবানের নাম জপ, স্তবপাঠ বা প্রার্থনা, তন্নিমিত্ত ফল, জল ও পুষ্প আহরণভাব-সংশোধনের আদি-অঙ্গ। স্থির আসনে বসিয়া প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি অবলম্বন মুক্তি-লাভের প্রশস্ত উপায়। শব্দময়ী প্রকৃতির শব্দসমষ্টির সূক্ষ্মত্বে মন ধারণা করিলে মন স্থির হয়। ষট্‌চক্রের যে কোন চক্রে বিশেষতঃ ভ্রূমধ্যে মনকে সংযত করিতে চেষ্টা করা উত্তম সাধনা।

প্রত্যাহার দ্বারা বহির্গমনশীল মনকে পুনঃ পুনঃ স্বীয় স্থানে আনিতে হইবে, প্রশ্বাস নির্গমকালে মনের গতিও বহির্ম্মুখ হইয়া থাকে, সেই সময় নিজশক্তি দ্বারা তাহাকে রোধ করিতে হয়। কিছু দিন এরূপ সাধনা করিলেই চিত্ত ও বাসনা ক্ষয় হইয়া মন স্থির হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন মানসিক পূজা ও ভগবৎলীলা-স্মরণ কামনা নিবৃত্তির পরম উপায়।

অপূর্ণ যে প্রকৃতি ক্রমে পূর্ণ হইতে চায়, পূর্ণ পদার্থ সেই নিয়মেই শূন্যস্থান অধিকার করে। অতএব আমরা ভোগ-বাসনায় হৃদয় পূর্ণ না রাখিয়া যদি নির্ব্বি-ষয় হইতে পারি, তখন সেই শূন্যস্থানে আত্মারই অধিকার হইবে। যেহেতু তিনি শূন্যস্থানে পূর্ণ বলিয়া নির্ব্বিকার নামে উক্ত হইয়া থাকেন। আমি যদি কোন ব্যক্তিকে প্রবল ভাবে চিন্তা করি,

তাহার অন্য গাঢ় চিন্তা না থাকিলে সেও আমাকে চিন্তা করিবে, এই প্রক্রিয়ার দ্বারা জানা যায়, চিন্তাশূন্য পরমেশ্বরকে লাভ করা গাঢ় চিন্তাশীলের পক্ষে অত্যন্ত সুলভ। ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তা স্থির হইলে তাহাকে ভাব বলে, সংযমিতভাব সময়-ক্রমে মহাভাবে পরিণত হয়। তাড়ি-তের একস্থানে সঞ্চালন করিলে যেমন সকল স্থান কাঁপিয়া উঠে, সেই প্রকার অপূর্ণ মহাভাবের সঞ্চালনে পরিপূর্ণ মহা-ভাব কম্পিত হয়। তখন সর্ব্বদ্রষ্টা পুরুষ একদেশদর্শী হইয়া উক্ত অসাধারণ ভাববিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অলৌকিকভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পৃথিবীব্যাপী তেজ যেমন চেষ্টাদ্বারা অগ্নিরূপে পরিণত হয়, সেই রূপ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যপদার্থ ভক্তিপূর্ণ ব্যাকুলতা দ্বারা আত্মমূর্ত্তিতে অবস্থান্তরিত হইয়া থাকেন।

যেহেতু মনের উপর বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব আছে। দেখা যায়, বুদ্ধি ইচ্ছাপূর্ব্বক সকল চিন্তাকে বাদ দিয়া ঈশ্বরচিন্তা আনিতে পারে, এবং অভ্যাসবলে সেই সময় বৃদ্ধি করিতেও পারে, বুদ্ধিকে শক্তি প্রয়োগ করিয়া বেশী দিন এ কার্য্য করিতে হয় না, ক্রমে উক্ত অভ্যাস পরিপক্ক হইলে এপ্রকার আশ্চর্য্যভাবে তথায় স্থিতি ঘটে যে, বুদ্ধির আর কোন কর্ত্তৃত্বও থাকে না, মহাভাবে মগ্ন হইয়া বহু সময় ক্ষণকালের ন্যায় কাটিয়া যায়। এই সাধনা বর্ত্তমানে অসম্ভব হইলেও যেমন চেষ্টা দ্বারা সম্ভব, সেই প্রকার ঈশ্বরলাভ বর্ত্তমানে অসম্ভব হইলেও সাধন দ্বারা সুসম্ভব হইবে।

জ্ঞানচর্চ্চায় ইন্দ্রিয়-সংযম হয়, বিজ্ঞান আলোচনায় দেহ ও ভোগ লক্ষ্যহীন অবস্থায় তন্ময় হইতে দেখা যায়, ইহাকেও

সাধন বলে। কিন্তু কোন স্বার্থের জন্য যে আলোচনা স্বার্থসিদ্ধির পরে আর তাহা থাকে না, সুতরাং এস্থলে উক্তরূপ সাধনের কথা হইতেছে না। অনন্তের একদেশ না দেখিয়া সকল দেশ দেখিতে ইচ্ছুক বিজ্ঞানীকে প্রজ্ঞানী বলা যায়। তাঁহার কার্য্য উদ্ধার হইতে কত কত জন্ম কাটিয়া যায়, কত কত আশ্চর্য্য দেখিয়া বোবার স্বপ্নের ন্যায় নিজেই তাহা উপভোগ করেন, কিছুতেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন না। আর তাঁহার কিছু-তেই প্রয়োজন নাই বলিয়া কোনরূপ উৎকণ্ঠাও থাকে না।

সত্য কথা ভিন্ন মিথ্যা না বলিলে বাক্য সিদ্ধ হয়, হিংসাশূন্য হইলে কোন হিংস্র পশুতেও হিংসা করে না, পরদ্রব্যে লোভ বা চুরি না করিলে কোন দ্রব্যের অভাব হয় না; ব্রহ্মচর্য্য-পালনে পীড়া

থাকে না, সন্তোষসাধনে দুঃখ দূর হয়, পরিগ্রহশূন্য হইলে বাঞ্ছিত ভোগ জোটে, সাধকের পক্ষে এই সকল আশ্চর্য্য নহে।

এ জন্মে গন্ধ গ্রহণের আসক্তি ত্যাগ করিলে, জন্মান্তরে মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ ঘটে না, রসের আশা না করিলে জলের সহিত সম্মিলিত হইতে হয় না, রূপে অনুরাগহীন হইলে তেজের অধীনতা লঙ্ঘন করা হয়, স্পর্শসুখের কামনা-রহিত হইলে বাতাসের আয়ত্তাধীন হইতে হয় না, শব্দের জন্য লালায়িত না হইলে আকাশের অতীত হওয়া যায়, কেননা পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা পঞ্চভূত মানসে সঞ্চিত হইয়াই জন্মান্তরের দেহ উপাদান হয়। ইন্দ্রিয়-জয় জড়দেহের নাশক হইলেও সাধনের শেষ নহে। ইহাতে প্রেত-লোক বা ভুবর্লোকে গতি হইয়া থাকে মাত্র। আর এই দেহে শ্বাস প্রশ্বাস বা

প্রাণশূন্য হইতে পারিলে স্বর্গলোকে গতি হইয়া থাকে। মন শূন্য হইলে মহর্লোকে গতি হয়, আর বাহ্যভাবহীন হইলে ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্তি হয় এবং বাহ্যজ্ঞানহীন আত্মজ্ঞান পূর্ণ হইলেই সত্যলোকে অবস্থান ঘটে। ইহাই শান্তি, মঙ্গল, অভয় ও অমৃত। এই সকল সাধনের ফল যিনি সংযোজন করেন, সেই সর্ব্ব কারণের কারণ অচ্যুতকে না ভুলিলে কখনই বিচ্যুত হইতে হয় না। অতএব পরমেশ্বরের উপাসনা সর্ব্বাগ্রে ও সাধনের শেষে একমাত্র প্রয়োজন।

যিনি মৃত্তিকাসমষ্টির ধারণ জন্য পর্ব্বত-রূপে, জল রক্ষণার্থে সমুদ্ররূপে, তেজ-সমষ্টির আধার হইয়া সূর্য্যরূপে বিদ্যমান আছেন; যিনি বায়ু-সংরক্ষণার্থ আকাশ-রূপে, অহংতত্ত্ব বাঁচাইবার জন্য ভূতনাথ রূপে, মহত্তত্ত্ব-রক্ষার্থে ব্রহ্মারূপে, অবস্থান

করেন ; যিনি প্রকৃতি রক্ষার্থে মহামায়া-রূপে, প্রজ্ঞান রক্ষার্থে বিষ্ণুরূপে এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার্থে তুরীয় ব্রহ্মশিব-স্বরূপ নারায়ণরূপে সর্ব্বব্যাপী রহিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত শারীরিক ব্যাপারজ্ঞ জীবের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে স্থলে যাহা হয়, তাহা অবগত থাকেন, আমরা আসক্তি ও বিরক্তির বশীভূত, সুতরাং শারীরিক সুখ দুঃখাদি ঘটনায় উল্লাসিত বা ব্যাকুলিত হইয়া থাকি। পরমেশ্বর আসক্তি বিরক্তির অতীত, সেই জন্য ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। ইহা ভিন্ন আমরা জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিযুক্ত, এইহেতু সকল সময় সমভাবে শরীরকে জানিতে পারি না। পরমেশ্বর উক্ত অবস্থাত্রয়ের অতীত, সেই জন্য সর্ব্বদা সমভাব ভিন্ন বিষমভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে জানেন না, সুতরাং

তাঁহার কোন বিষয়ে কৌতূহল জন্মে না। কিন্তু তিনি ভক্তগণের অলৌকিক স্বভাব দেখিয়া কৃপা করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যে জীবের যে প্রকার প্রকৃতি, সে সেই প্রকার জীবের সাহায্য পাইয়া থাকে, ইহা চির-প্রসিদ্ধ নিয়ম। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা নারদ, শুকদেব, সনক, সনাতন আদির সাহায্য পাইতেছেন, আর যাঁহারা ভগবানের তুল্য, তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সাহায্য না পাইবেন কেন?

জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন। মায়াই তাহাকে ভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যেমন সূর্য্য হইতে জাত ও প্রকাশিত মেঘ সূর্য্যকেই আবরণ করে, সেইরূপ আত্মা হইতে জাত ও আত্মপ্রকাশিত অহঙ্কারাত্মিকা মায়া আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়া জীব হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছে। পদ্মপত্রস্থিত বারিবিন্দু এবং পদ্মাধার

জল যেমন এক বস্তু, সেইরূপ জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, কেবল পদ্মপত্ররূপ মায়া উপাধি তাহাকে ভিন্ন রাখিয়াছে মাত্র। সুতরাং জীব অহঙ্কারের সীমার মধ্যে থাকিয়া আমি বালক, যুবক, বৃদ্ধ, রোগী দুঃখী, শোকাতুর, অজ্ঞানী, নির্ধনী ইত্যাদি ভাব এবং এই সকল বিপরীত ভাব পোষণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র আমি ও আমার সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পর্য্যন্ত আমার। এই অষ্টপ্রকৃতির অতীত হইলে আমি ভিন্ন আমার বলিতে কিছু থাকে না। তখন জীব আপন পূর্ণসত্ত্বায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অখণ্ড-চৈতন্যরূপে বলিতে পারেন "স্বপ্নকালে মন যেমন কোন বস্তুর অব-স্থান ব্যতীত দৃশ্য-দ্রষ্টা, জ্ঞান-জ্ঞেয়, ভোগ্য-ভোগী সাজিয়া সুখ বা দুঃখ বোধ

করে। সেইরূপ আমিই নিজ মায়া দ্বারা বহুরূপে পরিণত হইয়া মিথ্যা আমি আমার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। তখন সেই মায়ামুক্ত জন জানিতে পারেন যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হইয়াছিল। তখন তিনিই দেখিতে পান ক্ষুদ্র তৃণ হইতে অনন্ত জগতই ব্রহ্মময়। তখন তাঁহারই জ্ঞান হয় আমিই ব্রহ্ম।

মায়ামুক্ত জন আরও দেখেন, ঈশ্বরই পিতামাতারূপে সন্তান উৎপাদন করিতেছেন, প্রতিপালকরূপে পালন করিতেছেন, পীড়া ও কালরূপে বিনাশ করিতেছেন। তিনিই মিত্ররূপে প্রণয় করিতেছেন, শত্রুরূপে হিংসা করিতেছেন ভক্ষ্যরূপে আহারীয় হইতেছেন এবং ভোক্তারূপে ভোজন করিতেছেন, তিনিই ভয়রূপে ভীতিদাতা, অভয়রূপে আশ্রয়

দাতা, সুখরূপে আনন্দ প্রদাতা, এবং দুঃখরূপে সংহারকর্ত্তা। তাঁহারই শাসনে বাতাস বহন করে, সূর্য্য উত্তাপ দেয়, ইন্দ্র বর্ষণ করে এবং মৃত্যু সকল প্রাণীর উপর ধাবিত হইয়া থাকে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার রূপ, অসীম কার্য্যই তাঁহার লীলা এবং সর্ব্বাতীত্যই তাঁহার স্বরূপ।

(সমাপ্ত)

তত্ত্বপরিচয় সম্বন্ধে অভিমত

ডিষ্ট্রিক্ট সেসন-জজ্ কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু বরদাচরণ মিত্র মহোদয়ের অভিমত--

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ প্রণীত 'তত্ত্ব-পরিচয়' পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে ভাবুকতা, চিন্তাশক্তি ও ভাষার উপর অধিকার তিনই বিদ্যমান আছে। বিষয় দুরূহ। চিন্তা ও আলোচনা শক্তি প্রবল না থাকিলে হৃদয়ঙ্গম করা আয়াস সাধ্য। উপমা-উদাহরণ ও কালোচিত যুক্তি-তর্ক অবলম্বনে গ্রন্থকার হিন্দুশাস্ত্র প্রতিপাদিত সৃষ্টি-তত্ত্ব সাধারণের বোধের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ও যথাসম্ভব সফলকাম হইয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও উদ্যম সাধু।

সিউড়ি, বীরভূম শ্রীবরদাচরণ মিত্র
৮ঠা আগষ্ট, ১৯১১

কাশীমবাজারের মহারাজার প্রাচীন গ্রন্থসম্পাদক কাব্যতীর্থ, বাচস্পতি, কবিরত্ন প্রভৃতি উপাধিধারী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের অভিমত—

শ্রীযুত উপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ প্রণীত তত্ত্ব-পরিচয় পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। লেখাতে বেশ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গেল। ইনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা অতি গুরুতর

দার্শনিক রহস্যে পরিপূর্ণ। ভগবৎকৃপায় লেখক আলোচনা-পরিপুষ্ট স্বাধীন চিন্তার বলে উক্ত গুরুতর বিষয়ে বেশ মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন। যদিও ইহাতে শাস্ত্রবিশেষের সহিত এক আধ কথার অনৈক্য দেখিলাম, কিন্তু তাহার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করা হয় নাই। শাস্ত্রীয় অনুভব লেখকের অনুভবের সহিত সম্মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ও অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রানুরাগী চিন্তাশীল জ্ঞানপিপাসু পাঠকবর্গ এই পুস্তক পাঠ করিলে সুখী হইবেন, ইহা আশা করি।

শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ

বেলডাঙ্গা হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুত যোগীন্দ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের অভিমত—

শ্রীযুত উপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ প্রণীত তত্ত্ব পরিচয় পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। ইহাতে বহু সংশয়ের মীমাংসা আছে, তজ্জন্য প্রথম তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীগণ ইহা হইতে নিজ নিজ ধারণার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি পাইবেন। বিশ্বাস, ইন্দ্রিয়সংযম কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তির বিষয় লিখিত থাকায় এই গ্রন্থ শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ব্যক্তির পর্যান্ত আদরের জিনিষ হইয়াছে। শিক্ষার্থীদিগের মঙ্গল-কামনায় ইহার বহুল প্রচার আবশ্যক, ইত্যলম্।

শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ